প্রাথমিক বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

প্রাথমিক বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণি

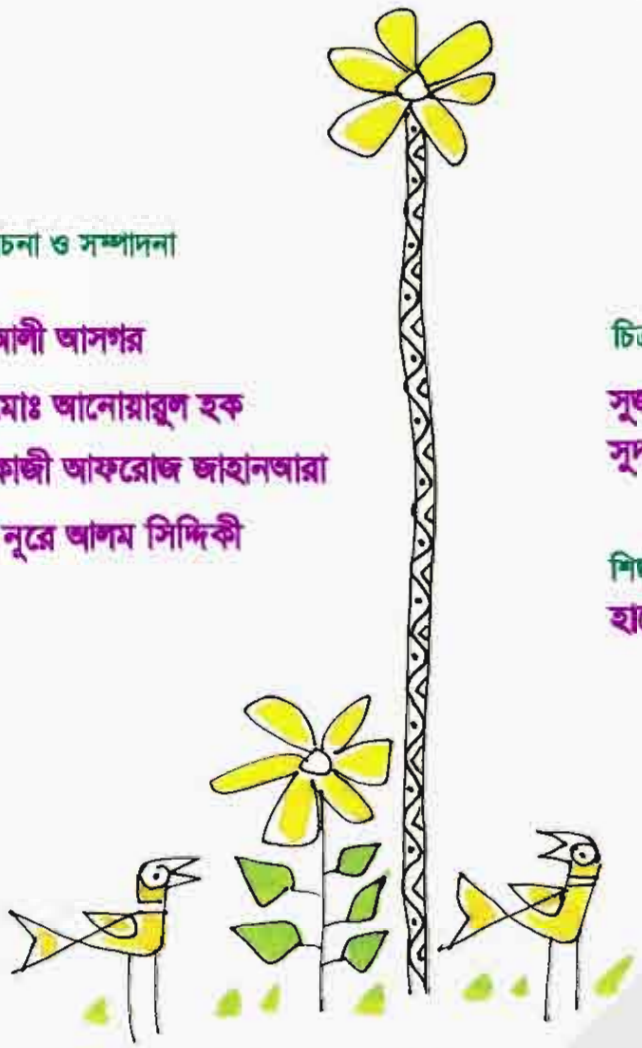

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর আলী আসগর

প্রফেসর মোঃ আনোয়ারুল হক

প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহানআরা

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

চিত্রাঙ্কন

সুজাউল আবেদীন কিষান

সুদর্শন বাছার

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : ২০১২

সমন্বয়ক
খন্দকার মোঃ মঞ্জুরুল আলম

গ্রাফিক্স
মোঃ আবুল হোসেন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই বিপুল ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০–এ নির্ধারিত হয় শিশু–শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

শিশুদের চারপাশে রয়েছে নানা বস্তু । প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত ঘটছে নানা ঘটনা। পানির গ্লাস, বায়ুভরা বেলুন, গাছ, ফুল, ভোরের সূর্য, রাতের তারাভরা আকাশ– সবই গভীর আনন্দের ও অপার বিস্ময়ের। শিক্ষার্থীর ভালোলাগার এই অনুভূতি তার দেখা নানা বস্তু ও ঘটনা নিয়ে নানা প্রশ্ন তাকে অনুসন্ধিৎসু ও অনুসন্ধানী করে তোলে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে এই উপলব্ধি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়েছে যে, বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য কিছু তথ্য জানা ও মুখস্থ করা নয়। সম্পর্কহীনভাবে নিরস তথ্য মুখস্থ করার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে তথ্যের পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার দুটি মূলধারা গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন, অন্যটি হলো প্রশ্ন উত্থাপন, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, তথ্য ও তত্ত্বের শুদ্ধতা যাচাইয়ের ভিতর দিয়ে অংশগ্রহণ। এই দুটি উপাদান পরস্পরের পরিপূরক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয় পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আর একটি লক্ষ্য।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	জীব ও আমাদের পরিবেশ	১
দ্বিতীয়	পরিবেশ দূষণ	৬
তৃতীয়	জীবনের জন্য পানি	১১
চতুর্থ	বায়ু	১৮
পঞ্চম	পদার্থ ও শক্তি	২৭
ষষ্ঠ	সুস্থ জীবনের জন্য খাদ্য	৩৫
সপ্তম	স্বাস্থ্যবিধি	৪৩
অষ্টম	মহাবিশ্ব	৫১
নবম	আমাদের জীবনে প্রযুক্তি	৫৯
দশম	আমাদের জীবনে তথ্য	৬৮
একাদশ	আবহাওয়া ও জলবায়ু	৭৪
দ্বাদশ	জলবায়ুর পরিবর্তন	৮১
ত্রয়োদশ	প্রাকৃতিক সম্পদ	৮৭
চতুর্দশ	জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ	৯৩

প্রথম অধ্যায়

জীব ও আমাদের পরিবেশ

জড় পরিবেশ ও জীব পরিবেশে কী কী থাকে তা তোমরা জান। জড় পরিবেশ নানাভাবে জীবের জীবনধারণকে প্রভাবিত করে। জড় পরিবেশে রয়েছে পাহাড়, জঙ্গল, পুকুর, নদী, সমুদ্র, গ্রাম, শহর যেখানে বিভিন্ন জীব বাস করে। এ ছাড়াও আলো, বাতাস, তাপ, মাটি, আর্দ্রতাসহ পরিবেশের সমস্ত উপাদানের সাথে জীবের সম্পর্ক রয়েছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য কোন কোন উপাদান প্রয়োজন?

এ প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই অনুসন্ধান করতে পার।

কাজ: ১. তোমার স্কুলের বাইরের পরিবেশে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তা লক্ষ কর। নোট খাতায় এগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

২. বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর কী কী প্রয়োজন তা পর্যবেক্ষণ করে নোট খাতায় লিখ।

৩. কীভাবে এই প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকায় সাহায্য করছে তা শ্রেণিতে আলোচনা কর।

পরিবেশের মাটি, পানি ও বায়ু ইত্যাদি উপাদান মানুষসহ পরিবেশের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তোমরা চতুর্থ শ্রেণিতে তা জেনেছ। বায়ু ছাড়া যেমন কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণী বাঁচে না, তেমনি পানি না থাকলেও কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণী বাঁচতে পারে না। তাহলে বুঝতে পারছ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য মাটি, পানি, বায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে তোমরা নিচের কাজগুলো করতে পার।

কাজ: ১. তোমার স্কুলের আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করো।

২. পরিবেশে কীভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের ওপর নির্ভরশীল তা লক্ষ করে দলগতভাবে পোস্টার কাগজে চিত্র আঁক।

৩. দলের কাজ শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

তোমরা জানলে জীবজগতে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের সাহায্যে বেঁচে থাকে।

উদ্ভিদের উপর প্রাণীর নির্ভরশীলতা

পরাগায়ন

উদ্ভিদের পাতায় সবুজ কণিকা রয়েছে। এই সবুজ কণিকা হচ্ছে ক্লোরোফিল। যা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে। উদ্ভিদ এই ক্লোরোফিলের সহায়তায় সূর্যের আলো ও পানির সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। উদ্ভিদ এ খাদ্য নিজে ব্যবহার করে। প্রাণীও এই খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। এর কারণ প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না। কাজেই পৃথিবীর সকল প্রাণী খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল।

সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরির সময় কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন বায়ুতে ছাড়ে। আবার প্রাণী শ্বাসকার্যে অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন ডাই–অক্সাইড ছাড়ে। উদ্ভিদ ও প্রাণী কার্বন ডাই–অক্সাইড এবং অক্সিজেন এর জন্য একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

তোমরা জান সব প্রাণী মলমূত্র ত্যাগ করে। যখন কোনো প্রাণী মারা যায়, তখন সেগুলো মাটিতে মিশে গিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এগুলো উদ্ভিদের বাঁচার জন্য একান্ত প্রয়োজন। কীটপতঙ্গ, পাখি ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্ভিদের পরাগায়ন ঘটে। এছাড়া অনেক প্রাণীর মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক উদ্ভিদ আছে যেগুলো বিভিন্ন প্রাণী এবং কীটপতঙ্গের আবাসস্থল। এসকল প্রাণী তাদের খাদ্যের জন্যও উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য কীভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

খাদ্য শৃঙ্খল কী

তোমরা লক্ষ করলে, উদ্ভিদ ও প্রাণী বিভিন্নভাবে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। লক্ষ করেছো কী – সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য শক্তি প্রয়োজন? এ শক্তি কোথা থেকে আসে?

তোমরা জান, শক্তির প্রধান উৎস সূর্য। উদ্ভিদের সবুজ পাতার ক্লোরোফিল সূর্যের আলোক শক্তিকে শোষণ করে পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইডকে ব্যবহার করে। এভাবে সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। প্রাণী তার খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল।

এবার নিচের চিত্রটি দেখ।

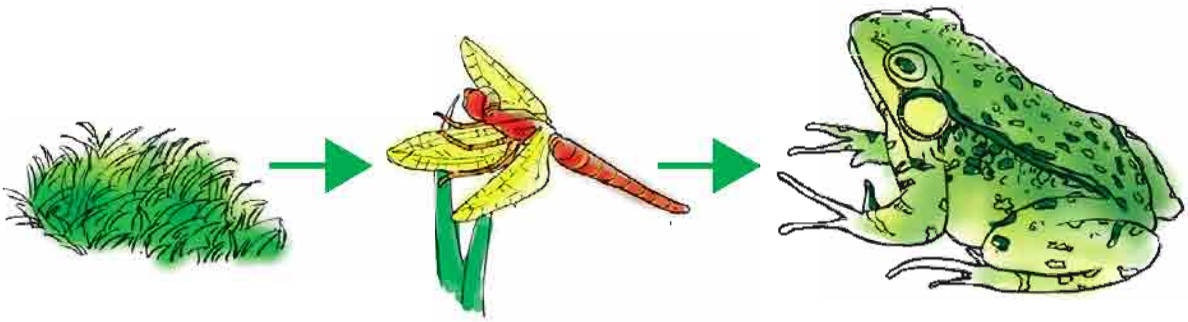

খাদ্য শৃঙ্খল

চিত্রে তুমি যে তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ দেখছো তা কোথা থেকে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে? উদ্ভিদ সূর্যের আলো ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন করে ও তা সংরক্ষণ করে। ছোট ছোট প্রাণী এ খাদ্য খায়। আবার ছোট প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বড় প্রাণী। এভাবেই পরিবেশে খাদ্য শৃঙ্খল তৈরি হয়।

খাদ্যজাল কী?

কাজ: ১. স্কুলের বাইরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটি খাদ্য শৃঙ্খল শনাক্ত কর।

২. যে কয়টি খাদ্য শৃঙ্খল শনাক্ত করেছ তা পোস্টার কাগজে অথবা পুরোনো ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠায় আঁক।

৩. দলীয়কাজ শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন কর এবং আলোচনা কর।

পাশের চিত্রটি লক্ষ কর।

চিত্রে কী দেখছো? এখানে যেভাবে দেখছো ঠিক একইভাবে তোমার নিকট পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে তুমি এর মধ্যে অনেক খাদ্যশৃঙ্খল দেখতে পাবে। যেগুলো একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কিত। পরিবেশে এটাই খাদ্যজাল নামে পরিচিত।

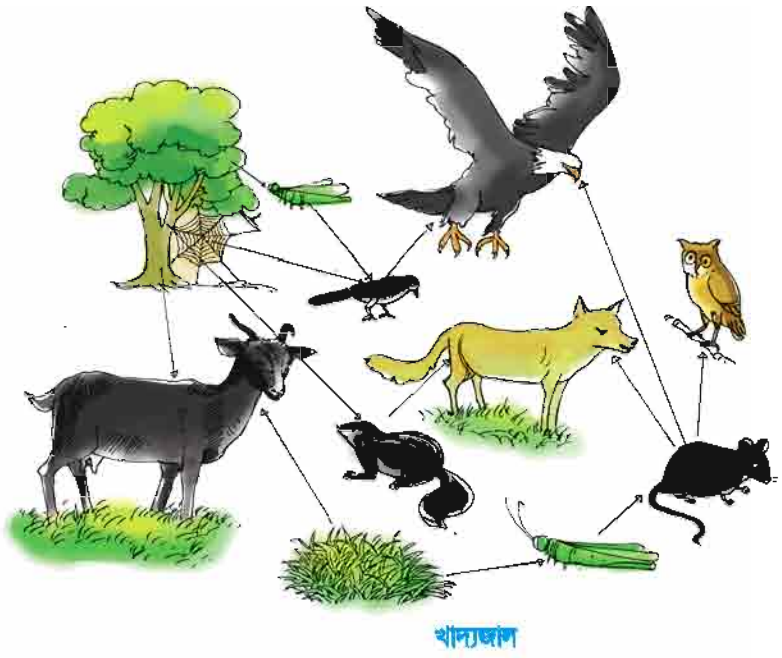

খাদ্যজাল

উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে আমরা খাদ্য ও ওষুধসহ আমাদের বেঁচে থাকার অনেক জিনিস পাই। আমাদের জীবনধারণের জন্য এগুলো অপরিহার্য।

কাজ: ১. পরিবেশে খাদ্য শৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ কর।

২. তোমার দেখা খাদ্য শৃঙ্খলের যে কোন একটি উদ্ভিদ বা প্রাণী যদি লুপ্ত হয়ে যায় তবে কী ঘটবে তা লক্ষ কর এবং সহপাঠীদের সাথে শ্রেণিতে আলোচনা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. প্রাণী নিজের ———— নিজে তৈরি করতে পারে না।

২. সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য ———— প্রয়োজন।

৩. কয়েকটি ———— যুক্ত হয়ে খাদ্যজাল তৈরি হয়।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. নিচের কোনটির জন্য প্রাণী উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল?
(ক) আলো
(খ) পানি
(গ) বীজ
(ঘ) খাদ্য

২. খাদ্যশৃঙ্খলের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ঘাস ফড়িং ⟶ তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ ⟶ সাপ ⟶ ব্যাঙ
(খ) ব্যাঙ ⟶ ঘাস ফড়িং ⟶ তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ ⟶ সাপ
(গ) সাপ ⟶ ঘাস ফড়িং ⟶ তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ ⟶ ব্যাঙ
(ঘ) তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ ⟶ ঘাস ফড়িং ⟶ ব্যাঙ ⟶ সাপ

৩. সবুজ পাতার ক্লোরোফিল নিচের কোন কাজে সহায়তা করে?
(ক) খাদ্য তৈরিতে
(খ) বংশ বৃদ্ধিতে
(গ) শ্বাসকার্যে
(ঘ) পরাগায়নে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিবেশের ওপর জীবের নির্ভরশীলতার দুটো উদাহরণ দাও।
২. খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্যজালের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

কাজ :

ক. তোমার এলাকার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে নোট খাতায় দুটো খাদ্য শৃঙ্খলের চিত্র আঁক।
খ. পোস্টার কাগজে একটি খাদ্যজালের চিত্র আঁক এবং শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবেশ দূষণ

তুমি যেখানেই থাক না কেন তোমার চার পাশের সবকিছু নিয়েই তোমার পরিবেশ। তোমার ওপর রয়েছে পরিবেশের প্রভাব। আবার পরিবেশের ওপর রয়েছে তোমার প্রভাব। বেঁচে থাকার জন্য আমরা পরিবেশকে নানাভাবে ব্যবহার করি। যার ফলে পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। এসব পরিবর্তন যখন আমাদের ক্ষতি করে তখন তাকে আমরা বলি পরিবেশ দূষণ।

পরিবেশ দূষণের উৎস কী?

কাজ: ১. তোমার এলাকা বা আশপাশের এলাকার পরিবেশ কীভাবে দূষিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করো।

২. পরিবেশ দূষণের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে খাতায় লিখ।

পরিবেশ দূষণের কারণ কী?

কাজ: নিচের ছকটি পোস্টার পেপারে তুলে নিয়ে ছকটি পূরণ কর। শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

বিভিন্ন প্রকার দূষণ	দূষণের কারণ	দূষণের প্রভাব
বায়ু দূষণ		
পানি দূষণ		
মাটি দূষণ		

বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পরিবেশে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ পরিবেশের উপাদানকে নানাভাবে ব্যবহার করছে। বিভিন্ন বর্জ্য সৃষ্টি করছে। ফলে পরিবেশের বায়ু, পানি ও মাটি দূষিত হচ্ছে।

বায়ু দূষণ

অপরিকল্পিতভাবে বাসগৃহ নির্মাণ, শিল্পকারখানা স্থাপন, যানবাহন চালানো, ভাটায় ইট পোড়ানো ইত্যাদি কারণে বায়ু দূষিত হচ্ছে। ঘনবসতি এলাকায় আবর্জনা ও মলমূত্র নিষ্কাশনের তেমন ভালো ব্যবস্থা না থাকায় বায়ু দূষিত হয়। বায়ুদূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। এ বিষয়ে তোমরা বায়ু অধ্যায়ে বিস্তারিত জানতে পারবে।

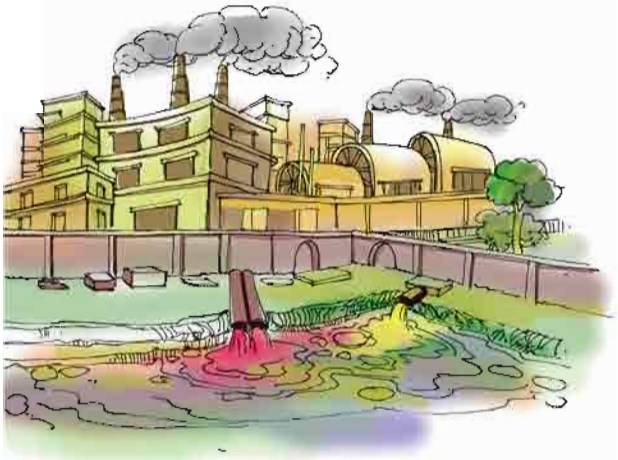

বায়ু ও পানি দূষণ

পানি দূষণ

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হচ্ছে। কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব বৃষ্টির পানির সাথে বা বিভিন্নভাবে পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, নদীর পানিকে দূষিত করছে। এছাড়াও অনেকে পুকুর বা জলাশয়ের উপর কাঁচা পায়খানা তৈরি করছে। যার ফলে পানি দূষিত হচ্ছে। কলকারখানার বর্জ্য, বাড়ির ব্যবহৃত আবর্জনা ইত্যাদির মাধ্যমেও নানাভাবে পানি দূষিত হচ্ছে।

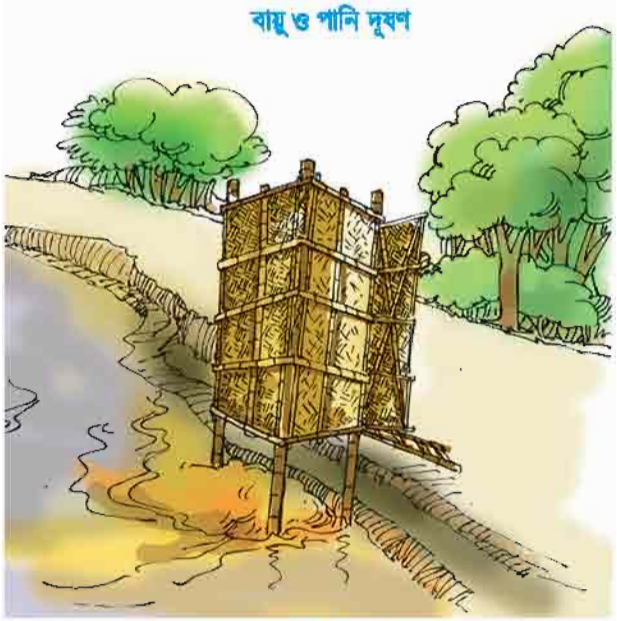

পানি দূষণ

পানি দূষণ

দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে মানুষ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, জলজ প্রাণীও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মাটি দূষণ

তোমরা চতুর্থ শ্রেণিতে মাটি দূষণ কী এবং কীভাবে ঘটে তা জেনেছ। কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের কারণে মাটি দূষিত হয়। ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। এছাড়াও হাসপাতালের বর্জ্য, প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদি কারণে মাটি দূষিত হয়। এসব দ্রব্য মাটিতে পচে না।

মাটি দূষণ

এই তিন ধরনের দূষণ ছাড়াও আরও এক ধরনের দূষণ রয়েছে। এটা হলো শব্দ দূষণ।

শব্দ দূষণ

শব্দ দূষণ

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো যে মানুষ যখন তখন যে কোনো স্থানে মাইক ব্যবহার করছে। উচ্চস্বরে গান বাজাচ্ছে। বিনা প্রয়োজনে গাড়ির হর্ন বাজাচ্ছে। এছাড়াও বসতি এলাকায় বিভিন্ন কলকারখানা তৈরি হয়েছে, লোডশেডিং এর কারণে জেনারেটর চলছে। ফলে শব্দ দূষণ ঘটছে।

শব্দ দূষণের প্রভাব

হঠাৎ উচ্চ আওয়াজ, গোলমাল, বিভিন্ন শব্দ মানুষের মানসিক ও শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব শব্দের কারণে মানুষের কানের ক্ষতিসহ স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষতি হয়। শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়, হাসপাতাল ও বাড়িতে রোগীদের সমস্যা হয়।

যানবাহনের হর্ন শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ

তোমার এলাকার শব্দ দূষণ রোধ করতে হলে তুমি কী করবে?

কাজ: ১. তোমার এলাকার শব্দ দূষণের উৎস সনাক্ত করো ও শব্দ দূষণ প্রতিরোধের উপায় কী হতে পারে তা নিচের ছক অনুযায়ী খাতায় লিখ।

উৎস	প্রতিরোধের উপায়

২. শ্রেণিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করো।

পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়

মানুষ ও অন্যান্য জীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন। তোমরা জেনেছে পরিবেশ বিভিন্ন ভাবে দূষিত হচ্ছে। বেড়ে চলেছে জনসংখ্যা। এসব বাড়তি মানুষের প্রয়োজনে কাটা হচ্ছে বনজঙ্গল। ফলে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। শহর অঞ্চলে গড়ে উঠছে অস্বাস্থ্যকর বস্তি। যেখানে আবর্জনা নিঃসরণসহ পয়ঃনিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা থাকে না। ফলে রোগব্যাধি সবসময় লেগে থাকে।

সুতরাং বনজঙ্গল সংরক্ষণসহ পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়োজন। মানুষসহ পরিবেশের সকল জীবকে বাঁচাতে হলে বনজঙ্গল কাটাসহ নদীনালা ভরাট বন্ধ করতে হবে। যেখানে সেখানে অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর, কলকারখানা তৈরি করা যাবে না। এসব ছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হলে কী কী করতে হবে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. নিচের কোন কারণে বায়ু দূষিত হয়?

ক. কীটনাশকের ব্যবহার　　খ. ইটের ভাটায় ইট পোড়ানো

গ. বৃষ্টির পানি জমে যাওয়া　　ঘ. রাসায়নিক সার ব্যবহার

২. বায়ু, পানি ও মাটি দূষিত হওয়ার প্রধান কারণ কোনটি?
   ক. জলাশয়ের উপর কাঁচা পায়খানা তৈরি
   খ. কলকারখানার বর্জ্য
   গ. যানবাহনের ব্যবহার
   ঘ. জনসংখ্যার বাড়তি চাহিদা মেটানো

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শব্দ দূষণ রোধে তুমি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার সংক্ষেপে লিখ।
২. পরিবেশে পানি দূষণের প্রভাবে কী কী ঘটতে পারে লিখ।
৩. পরিবেশ সংরক্ষণের পাঁচটি উপায় লিখ।
৪. তোমার এলাকার পরিবেশ দূষণ রোধে তোমার বন্ধুদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার দুটো উপায় লিখ।

কাজ

ক. শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর।
খ. তোমার এলাকার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর।
গ. এলাকার মাটি, পানি, বায়ু কীভাবে দূষিত হচ্ছে সে সম্পর্কে এলাকা ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ কর এবং নোট খাতায় লিখে রাখ।
ঘ. দূষণের ফলে এলাকার পরিবেশ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা লক্ষ কর। দূষণ রোধের উপায় কী হতে পারে এবং এলাকার লোকজনকে কীভাবে সচেতন করা যায় তা দলে আলোচনা কর।
ঙ. এলাকার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনার ভিত্তিতে দূষণের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে প্রতি দল পোস্টার তৈরি কর এবং শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবনের জন্য পানি

পানি ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। পানি ছাড়া কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না। জীবনের জন্য পানি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি ও পুষ্টি উপাদান শোষণ করে। আমরা উদ্ভিদের ফল, পাতা ও শস্যদানা খাবার হিসেবে ব্যবহার করি। আমরা পানি পান করি। এছাড়া খাদ্যের ভিতরে অনেক পানি থাকে। খাদ্যের ভিতরে পানি না থাকলে আমরা শুকনা ও শক্ত খাদ্য কি খেতে পারতাম? খাদ্য গ্রহণের পর পানি খাদ্যকে তার উপাদানে ভেঙে ফেলতে সাহায্য করে। আমাদের শরীরে সঠিক তাপমাত্রা বজায় রাখতেও পানি দরকার । এসব কারণে মানুষের মতো গরু, ছাগল, বিড়াল, পাখি, সকল প্রাণীর জন্যই পানি অবশ্য দরকার।

পানিচক্র

তোমরা জান পানি নানা উৎস থেকে পাওয়া যায়। যেমন, আমরা বৃষ্টি থেকে পানি পাই। কখনো কখনো বর্ষাকালে বন্যার পানিতে দেশের নানা জায়গা ডুবে যায়। আচ্ছা বলতো, বন্যার পানি কোথা থেকে আসে? বর্ষা শেষে আবার তা কোথায় চলে যায়? পরের বছর আবার বর্ষাকালে কোথা থেকে বন্যার পানি আসে?

বৃষ্টি কীভাবে হয় তা তোমরা জেনেছ। সূর্যতাপ পুকুর, খাল, বিল, নদী ও সমুদ্রের পানিকে জলীয় বাষ্পে পরিণত করে। জলীয় বাষ্প বায়ুমন্ডলের উপরের দিকে উঠে ঠান্ডা হয়ে ক্ষুদ্র পানিকণায় পরিণত হয়। ক্ষুদ্র পানিকণা একত্র হয়ে আকাশে মেঘ হিসেবে ঘুরে বেড়ায়। মেঘের পানিকণাগুলো একত্রিত হয়ে আকারে বড় হয়ে বৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে। মেঘের পানিকণাগুলো খুব বেশি ঠান্ডা হয়ে গেলে তা বরফে পরিণত হয় এবং শিলাবৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে নেমে আসে। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর পানির সাথে মেশে। নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের পানিতে মেশে। এভাবে ভূ–পৃষ্ঠের পানি থেকে জলীয় বাষ্প, জলীয় বাষ্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি হিসেবে পানি আবার ভূ–পৃষ্ঠে ফিরে আসে।পৃথিবীতে পানি তার এক উৎস থেকে উৎসে চক্রাকারে ঘোরে।

আবার বায়ুপ্রবাহের কারণে জলীয় বাষ্প মেঘরূপে উড়ে গিয়ে পর্বতের চূড়ায় পৌছায়। সেখানে মেঘের পানিকণা ঠাণ্ডায় বরফে পরিণত হয়। এই বরফ গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে গলে পানি হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে। এভাবে ছোট পাহাড়ি নদীর উৎপত্তি হয়। এই নদীর পানি সবশেষে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। এভাবে পানির চক্রাকারে ঘুরে আসাকে পানিচক্র বলে। পাশের চিত্রটি দেখ। পানির চক্রাকারে ঘুরে আসাটা ভালোভাবে বোঝা যাবে।

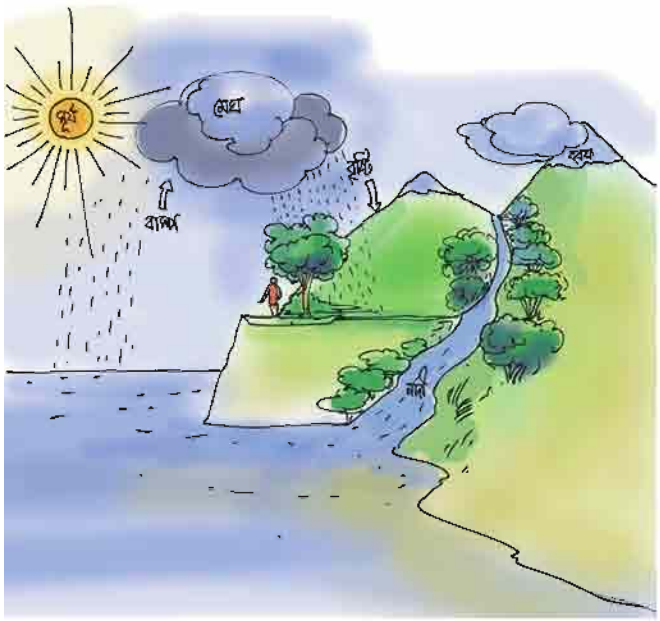

পানি চক্র

বায়ুতে সবসময় কিছু পরিমান বাষ্প থাকে। এবার নিচের পরীক্ষাটি কর।

একটি কাঁচের গ্লাসে কয়েক টুকরো বরফ নাও। কিছুক্ষণ রেখে দাও। এবার গ্লাসের বাইরে দেখ। গ্লাসের বাইরে কি পানি জমেছে? হাত দিয়ে গ্লাসটি ধরে নিশ্চিত হও। কোথা থেকে এলো এ পানি? গ্লাসের ভেতরের বরফ থেকে? গ্লাসের ভেতর থেকে পানি বাইরে আসতে পারে না। তাই গ্লাসের বাইরের পানি গ্লাসের বরফ থেকে আসেনি। তাহলে?

গ্লাসের বাইরে ফোঁটা ফোঁটা পানি

বরফের ঠান্ডার কারণে গ্লাসটি ঠান্ডা হয়েছে। আর সে ঠান্ডার পরশে বায়ুর জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে পানিকণায় পরিণত হয়েছে। এভাবেই জলীয় বাষ্প থেকে বৃষ্টি ও শিশির তৈরি হয়।

দূষিত পানি কী?

দুটি কাঁচের গ্লাস নাও। একটিতে নলকুপের বা ট্যাপের পানি আর অপরটিতে নর্দমা বা ডোবার পানি নাও। ভালোভাবে গ্লাস দুইটির পানি পর্যবেক্ষণ কর। এরপর নিচের ছকটি পুরণ করো।

অবস্থা	গ্লাস ১ (নলকূপ বা ট্যাপের পানি)	গ্লাস ২ (ডোবা বা নর্দমার পানি)
রং বা বর্ণ		
গন্ধ		
ভাসমান পদার্থ		
স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ		

তোমাদের কাছে কোন গ্লাসের পানি পান করা ক্ষতিকর মনে হয়েছে? নিশ্চয়ই যেটিতে ডোবা বা নর্দমার পানি আছে সেটি পান করা ক্ষতিকর। পানি দেখেও কিছুটা ধারণা করা যায় যে, তা পান করা নিরাপদ কিনা। ময়লাযুক্ত, অপরিষ্কার ও রঙিন পানিতে অনেক কিছু মিশে থাকে। এ পানি পান করার জন্য নিরাপদ নয়। পানিতে ক্ষতিকর কোনোকিছু মিশে থাকলে সে পানিকে দূষিত পানি বলা হয়।

তবে পানি পরিষ্কার দেখা গেলেও সবসময় তা নিরাপদ নাও হতে পারে। টলটলে পুকুরের পানিও দূষিত হতে পারে। খালি চোখে দেখা যায় না এমন রোগজীবাণু বা ক্ষতিকর পদার্থ এতে মিশে থাকতে পারে। নলকূপের পানি সাধারণত নিরাপদ। তবে আমাদের দেশে কিছু কিছু নলকূপের পানিতে আর্সেনিক নামক বিষাক্ত পদার্থ মিশে আছে। আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে হাত পায়ের চামড়ায় ঘা হতে পারে। পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা তা দেখে বোঝা যায় না। তবে নলকূপের পানি পরীক্ষা করে বোঝা যায় তাতে আর্সেনিক আছে কিনা। যে সকল নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে সেই নলকূপগুলোকে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব নলকূপের পানি পান করা যাবে না।

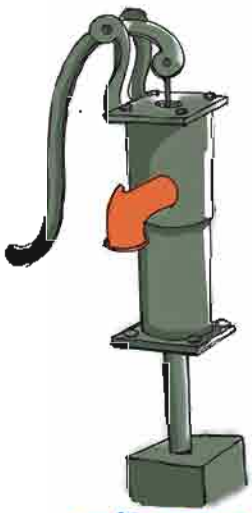

আর্সেনিকযুক্ত নলকূপ

কীভাবে পানি দূষিত হয়?

মানুষের অসাবধানী কাজের ফলে পানিতে নানা কিছু মিশে পানি দূষিত হয়। নিচে পানি দূষণের প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করা হলো:

- পুকুর বা নদীর পানিতে বাসন–কোসন মাজা, গোসল করা, ময়লা কাপড় কাচা, গোরু মহিষ গোসল করানো, পাট পচানো, পায়খানা প্রস্রাব করা, প্রাণীর মৃতদেহ ফেলা প্রভৃতি উপায়ে নদী–নালা, খাল–বিল ও পুকুরের পানি দূষিত হয়।

- কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড ও ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীর মলমূত্র, বিছানাপত্র ও জামাকাপড় পুকুর, খাল–বিল বা নদীর পানিতে ধুলে রোগে জীবাণু মিশে পানি দূষিত করে।

- কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ পানিতে ফেললে পানি দূষিত হয় কারণ এই বর্জ্য পদার্থে ক্ষতিকর পদার্থ মিশে থাকে।

- কৃষিকাজে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করলে তা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে খাল–বিল ও নদীর পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে।

- বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের সময় গ্রাম ও শহর অঞ্চল পানিতে ডুবে যায়। এতে মানুষ ও গৃহপালিত পশু–পাখির মলমূত্র পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে। এই দূষিত পানি পুকুর, কুয়া ও নলকুপের পানিতে মিশে পানযোগ্য পানিকে দূষিত করে তোলে।

- এছাড়া প্রাকৃতিক কারণে আর্সেনিক দূষণ হয়ে থাকে। মাটির নিচে আর্সেনিকের খনিজ থাকে। আর্সেনিক ভূ–গর্ভের পানির স্তরের সংস্পর্শে এলে তা পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে।

পানি দূষণের ফল

পানি মানুষের জীবনের জন্য আবশ্যক। কিন্তু দূষিত পানি জীবনের জন্য খুব ক্ষতিকর। এগুলো হলো:

- দূষিত পানি পান করলে আমরা কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, ডায়রিয়া এসব রোগে আক্রান্ত হতে পারি। এছাড়া পেটের পীড়া ও চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

- আর্সেনিক যুক্ত পানি দীর্ঘদিন পান করলে হাত পায়ে এক ধরনের ক্ষত বা ঘা তৈরি হয় যা আর্সেনোকোসিস রোগ নামে পরিচিত। এ রোগের সহজ কোনো চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ ধরা পড়লে আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করা বন্ধ করলেই সুস্থ হওয়া যেতে পারে। এ রোগ সংক্রামক নয়, অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস রোগীদের কাছে গেলে অন্যদের এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

পানি দূষণ রোধ

পানি দূষণ রোধ করতে হলে পানি দূষণের কারণগুলো দূর করতে হবে। নিচের ছকটি পূরণ কর। তাহলেই বুঝতে পারবে পানি দূষণ রোধে কী করতে হবে।

পানি দূষণের কারণ	পানি দূষণ রোধের উপায়

পানি শোধন

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমদের নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার করতে হবে।তাই পানিকে পান বা ব্যবহার করার পূর্বে শোধন করে নিতে হয়। বিভিন্ন উপায়ে পানিকে শোধন করা যায়। নিচে এই উপায়গুলো বর্ণনা করা হলো।

১। **ছাঁকন:** পুকুর, খালবিল ও নদীর পানিতে কাদা ও ময়লা মিশে থাকে। পাতলা কাপড় বা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে এ পানি পরিষ্কার করা যায়। তবে পরিষ্কার হলেও এভাবে পানি জীবাণুমুক্ত হয় না। আজকাল শহরের অনেক বাড়িতে উন্নতমানের ছাঁকনযন্ত্র বা ফিল্টার রয়েছে। এ ধরনের ফিল্টার দ্বারা পানিকে বেশির ভাগ জীবাণু থেকে মুক্ত করা যায়। তবে কোন কোন জীবাণু রয়ে যেতে পারে। পানিকে পুরোপুরি নিরাপদ করতে হলে পানিকে ফুটাতে হবে।

২। **থিতানো:** নদী বা পুকুরের পানি কোন কলস বা পাত্রে রেখে দাও। দেখবে পাত্রের তলায় তলানি জমেছে। উপরের অংশের পানি পরিষ্কার হয়ে গেছে। তলানি জমে যাবার পর কলস বা পাত্রটি অল্প কাত করে উপরের পানি অন্য পাত্রে ঢেলে নাও। এ ভাবে পরিষ্কার পানি আলাদা করার পদ্ধতিকে থিতানো বলে। পাত্রের পানিতে অল্প ফিটকিরি দিলে তাড়াতাড়ি তলানি জমে এবং পানি কিছুটা জীবাণুমুক্ত হয়।

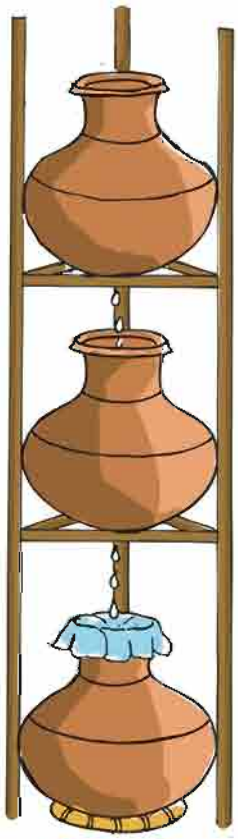

ছাঁকন পদ্ধতি

৩। **ফুটানো:** পুকুর, নদী বা ট্যাপের পানি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করতে চাইলে পানিকে ফুটাতে হবে। পানি ফুটতে শুরু করার পর আরও ২০ মিনিট তাপ দিলে পানিতে থাকা জীবাণু মারা যায়। এরপর পানিকে ঠান্ডা করে ছেঁকে নিলে তা পান করার জন্য নিরাপদ হয়।

ফিল্টার যন্ত্র

৪। **রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে পানি বিশুদ্ধকরণ:** অনেক সময় বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে পানি ফুটানো সম্ভব হয় না। তখন ফিটকিরি, ব্লিচিং পাউডার, হ্যালোজেন ট্যাবলেট ইত্যাদি পরিমাণ মতো মিশিয়ে পানিকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। বড় বড় শহরে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নদীর পানি শোধন করে ঘরে ঘরে সরবরাহ করা হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ——— অবশ্য প্রয়োজনীয়।
২. সূর্যের তাপে পানি ——— পরিণত হয়।
৩. মেঘ আসলে ছোট ছোট ——— মিলে তৈরি হয়।
৪. পানি থেকে জীবাণু মেরে ফেলতে চাইলে পানিকে ——— হবে।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. প্রাকৃতিক কারণে পানির কোন দূষণটি হয়ে থাকে?

ক. আর্সেনিক দ্বারা দূষণ
খ. কীটনাশক দ্বারা দূষণ
গ. কলকারখানা বর্জ্যদ্বারা দূষণ
ঘ. জীবাণু দ্বারা দূষণ

২. উদ্ভিদ মাটি থেকে কীসের সাহায্যে পুষ্টি উপাদান শোষণ করে?

ক. মাটি　　খ. পানি
গ. বায়ু　　ঘ. আলো

৩. উঁচু পর্বতের চূড়ায় পানি কী রূপে থাকে?

ক. পানি　　খ. জলীয় বাষ্প
গ. শিশির　　ঘ. বরফ

৪. যে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকে তাকে কোন রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়?

ক. নীল　　খ. লাল
গ. সবুজ　　ঘ. আকাশী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কাঁচের গ্লাসে বরফের টুকরা রাখলে গ্লাসের বাইরের গায়ে পানি জমে কেন?
২. আর্সেনিক দূষণের কারণ কী?
৩. দূষিত পানি পান করলে কী কী রোগ হতে পারে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ পানি চক্র ব্যাখ্যা কর।
২. বায়ুতে যে সবসময়ই কিছু জলীয় বাষ্প থাকে তা কীভাবে প্রমাণ করবে?
৩. পানি দূষণের প্রধান কারণগুলো লিখ।
৪. পানিদূষণ কীভাবে রোধ করা যায়?
৫. পুকুরের পানিকে জীবাণুমুক্ত করতে হলে কীভাবে শোধন করতে হবে?

চতুর্থ অধ্যায়

বায়ু

আমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে বায়ু। বায়ুর এই আবরণকে বলে বায়ুমণ্ডল। আবার মাটিকণার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে। পানিতেও বায়ু মিশে থাকে। পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বায়ু।

বায়ুতে প্রধানত নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প থাকে। শ্বাস নেওয়ার মাধ্যমে আমরা বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি। অক্সিজেন আমাদের গ্রহণ করা খাদ্য ভেঙে শক্তি উৎপাদন করে। এই শক্তি আমাদের শরীরকে গরম রাখে। পানিতে যে বায়ু আছে সেই বায়ু থেকে মাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকে।

বায়ুর ব্যবহার

অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বলে না। আগুনের সাহায্যে আমরা খাবার রান্না করি ও পানি ফুটাই। জ্বালানি পুড়িয়ে কল কারখানা চালাই, গাড়ি চালাই, বিদ্যুৎ উৎপাদন করি। বায়ু না থাকলে আমরা এসব কাজ করতে পারতাম না।

বায়ুকে আমরা নানা ভাবে ব্যবহার করি। নিচের কাজটি করো।

কাজ:

ক. একটি ফুটবল নাও। ফুটবলটিতে বায়ু থাকলে বায়ু বের করে দাও। ফুটবলটি কি চুপসে গেছে?

খ. চুপসে যাওয়া ফুটবলটিকে মাঠে রেখে জোরে লাথি দাও। ফুটবলটি কতদূর গেল তা একটা লাঠি দিয়ে চিহ্নিত কর। পরপর তিনবার চুপসানো ফুটবলটিকে একইভাবে লাথি দাও এবং এটি কতদূরে গেল তা চিহ্নিত কর।

গ. এবার ফুটবলটিকে পাম্প দিয়ে বায়ুপূর্ণ কর।

ঘ. বায়ুপূর্ণ ফুটবলটিকে আগের জায়গায় রেখে জোরে লাথি দাও। ফুটবলটি এবারে কতদূর গেল তা চিহ্নিত কর। একইভাবে তিনবার লাথি মেরে ফুটবলটি কতদূর গেল তা চিহ্নিত কর।

চুপসানো ফুটবল

বায়ুপূর্ণ ফুটবল কি বেশি দূরে যায়, না বায়ুশূন্য ফুটবল?

আলোচনা: বায়ুশূন্য চুপসানো ফুটবল লাথি দিলে বেশি দূর যায় না। বায়ুভর্তি করে ফুটবলকে লাথি দিলে বা গড়িয়ে দিলে তা অনেকদূর যায়। এভাবে বায়ুভর্তি করে আমরা সুবিধা পাই। সাইকেল, রিকশা ও গাড়ির চাকার টায়ারেও বায়ুভর্তি করে নেওয়া হয়। এতে সাইকেল, গাড়ি বা রিকশা তাড়াতাড়ি চলে। সাইকেল ও রিকশা চালাতে কম কষ্ট হয়।

বায়ুভর্তি ফুটবল

বায়ুর বিভিন্ন উপাদানকে আমরা নানা কাজে ব্যবহার করি। শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য অনেক সময় সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। উঁচু পর্বতে উঠতে গেলেও সিলিন্ডারে করে অক্সিজেন নিয়ে যেতে হয়। পর্বতের চূড়ায় অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। আবার পানির নিচে আমরা শ্বাস গ্রহণ করতে পারি না। তাই ডুবুরিরা যখন কোনো কিছু খুঁজতে অনেকক্ষণ নদী বা সমুদ্রের পানির নিচে থাকেন তখন অক্সিজেনের সিলিন্ডার সাথে নেন।

রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া

পানির নিচে

পর্বতের চূড়ায়

অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবহার

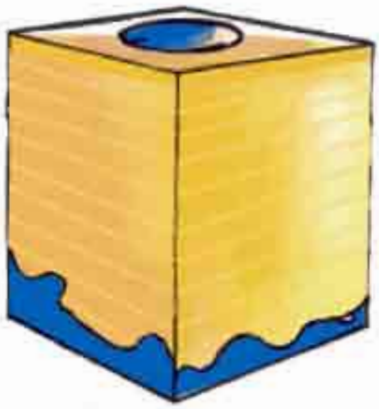

টিনজাত খাবার

চিপসের প্যাকেট

তোমরা ইউরিয়া সার চেন? গাছের বৃদ্ধির জন্য এ সার দেওয়া হয়। আর ইউরিয়া সার প্রস্তুতিতে বায়ুর নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়। আবার টিন বা প্যাকেটে নানা ধরনের খাবার যেমন– মাছ, মাংস, ফল, চিপস ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়।

তোমরা বিভিন্ন কোমল পানীয় পান করেছ নিশ্চয়ই। কোমল পানীয়ের বোতলের ছিপি খুললে কী দেখতে পাও। বুদবুদ বের হয়, তাই না? এ বুদবুদ আসলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের। বোতলে কোমল পানীয়ের সাথে উচ্চচাপে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মিশানো হয়। এর ফলে পানীয়ের ঝাঁঝালো স্বাদ পাওয়া যায়।

পাশের চিত্রটি দেখ। এ রকম একটি জিনিস বিভিন্ন ভবনে, সিনেমা হলে, কলকারখানায় দেখা যায়। এটি আগুন নিভানোর বা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র। তোমরা জান অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বলে না। কোথাও আগুন লাগলে সাথে সাথে এ যন্ত্র থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ গ্যাস বায়ুর চেয়ে ভারী। তাই এ গ্যাস আগুনের উপর একটি একটি আবরণ তৈরি করে। এভাবে আগুন বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ফলে আগুন নিভে যায়।

অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র

বায়ু প্রবাহের ব্যবহার

কীভাবে আমরা বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগাতে পারি?

নিচের চিত্র ও বর্ণনা অনুযায়ী একটি চরকা তৈরি কর।

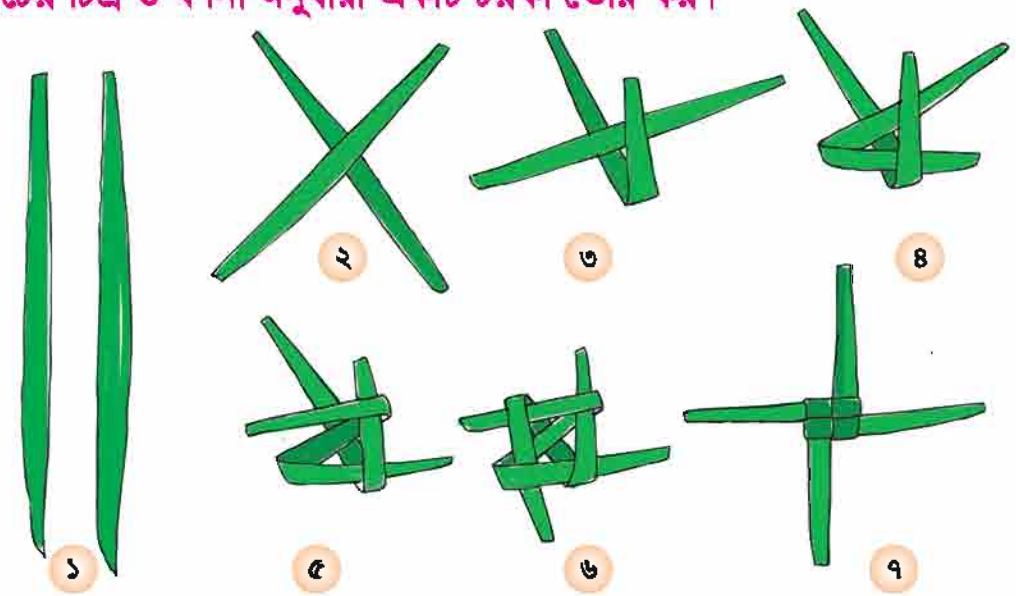

চরকা তৈরি কৌশল

কার্যপদ্ধতি:

(ক) একটি খেজুর পাতা/নারকেল পাতা লম্বালম্বি দুই ভাগ করো। (খ) একটি ভাঁজ করা পাতার মধ্যে আরেকটি ভাঁজ করা পাতা ঢোকাও। (গ) বড় অংশটি ঘুরিয়ে এনে তা লুপে ঢোকাও। (ঘ) বাকি পাতাটির বড় অংশটি ঘুরিয়ে এনে লুপে ঢোকাও। (ঙ) খেঁজুর কাটা বা পিনের আগায় চরকাটি স্থাপন করো।

এবার চরকাটি যেদিক থেকে বাতাস আসছে তার দিকে ধর। বায়ু প্রবাহিত না হলে এটিকে সামনে ধরে দৌড় দাও। দেখবে চরকাটি ঘুরছে। এভাবে বায়ুপ্রবাহকে ব্যবহার করে বড় চরকা বা টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এছাড়া বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে ফসল ঝেড়ে ময়লা দূর করা হয়, পালতোলা নৌকা চালান হয়।

পালতোলা নৌকা

ভেজা কাপড় রোদে ও খোলা জায়গায় কেন শুকাতে দিই? খোলা জায়গায় বায়ু কাপড় থেকে পানি শুষে নেয়। আজকাল ভেজা চুল শুকাতে অনেকেই চুল শুকানোর যন্ত্র ব্যবহার করেন। এ যন্ত্র চালালে বায়ু প্রবাহিত হয় যা তাড়াতাড়ি চুলের পানিকে শুষে নেয়।

যন্ত্র ব্যবহার করে চুল শুকানো

প্রবাহিত বায়ু তাপকে শোষণ করে। তাই আমাদের গায়ে বায়ুপ্রবাহ এসে লাগলে আমাদের ঠান্ডা লাগে। আমরা আমাদের শরীরকে ঠান্ডা রাখতে তাই হাতপাখা ও বৈদ্যুতিক পাখা থেকে বায়ুপ্রবাহকে ব্যবহার করি।

খোলা জায়গায় কাপড় শুকানো

বায়ুদূষণ কী?

বায়ু আমাদের জন্য খুব দরকারি। কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বায়ুতে নানা কিছু যোগ হতে পারে। আবার বিভিন্ন কারণে বায়ুর উপাদানগুলোর পরিমাণ কমে বা বেড়ে যেতে পারে। বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানের পরিবর্তন হলে আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। বায়ুর স্বাভাবিক উপাদান পরিবর্তন হওয়াকে বায়ু দূষণ বলে।

বায়ুদূষণের কারণ ও ফলাফল

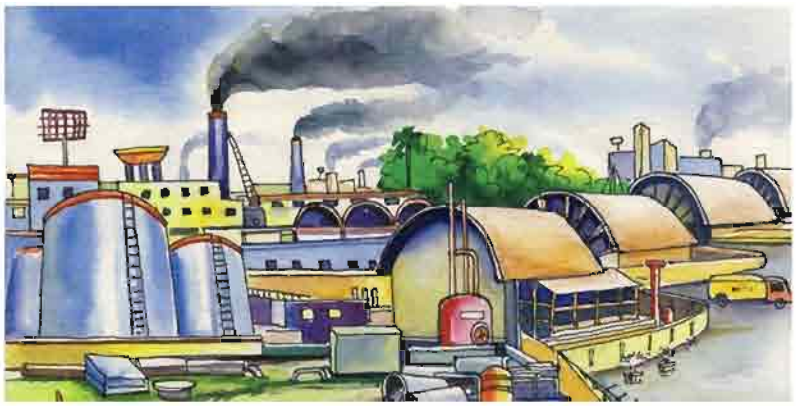

ইটের ভাটার ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া

বায়ু প্রধানত দূষিত হয় মানুষের কর্মকান্ডের ফলে। তোমরা দেখেছো আধা শুকনা গাছের ডাল ও পাতা পোড়ালে কেমন ধোঁয়া হয়? কাছে গেলে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে। তেমনি ইটের ভাটা, কলকারখানা, বাস, রেলগাড়ি, টেম্পো, বেবিট্যাক্সি থেকে কালো ধোঁয়া বাতাসে মেশে। এরকম ধোঁয়ায় থাকে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন কণা, কার্বন ডাই-অক্সাইড। এগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এরকম কালো ধোঁয়া মিশলে বায়ুদূষণ হয়।

কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হওয়ার আরেকটা জায়গা হলো রান্নার চুলা। চুলায় প্রাকৃতিক গ্যাস বা কাঠ পোড়ানোর সময় পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে তা ভালোভাবে পোড়ে না। ফলে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন করে। উৎপন্ন কার্বন মনোক্সাইড বেশ বিষাক্ত।

গাড়ির কালো ধোঁয়া

বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে গেলে বায়ু দূষিত হয়। এ সম্পর্কে আবহাওয়া ও জলবায়ু অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।
কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানোই বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির কারণ। আবার কয়লা পোড়ালে এতে মিশে থাকা সালফার পুড়ে বায়ুতে সালফারের অক্সাইড উৎপন্ন হয়। সালফারের অক্সাইড বৃষ্টির পানিতে মিশে বৃষ্টির পানিকে এসিডযুক্ত করে। এসিডযুক্ত বৃষ্টি সকল জীবের জন্য ক্ষতিকর।

যে ব্যক্তি ধূমপান করে তার নানা অসুখ হয়। সাথে সাথে বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া বায়ুকে দূষিত করে। ফলে অন্য মানুষদেরও ক্ষতি হয়। বিশেষ করে কেউ বন্ধ ঘরে ধূমপান করলে সেই ঘরে থাকা মানুষের আরো বেশি ক্ষতি হয়।

আবার যক্ষ্মা ও বসন্ত রোগীদের হাঁচি কাশি থেকে জীবাণু মিশে বায়ুকে দূষিত করে। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে ও পায়খানা প্রস্রাব করলে বায়ুতে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এভাবেও বায়ু দূষিত হয়। আবার রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি বানানোর সময় ছোট ছোট ধুলিকণা বায়ুতে মিশে দূষিত করে।

আমরা জানি যে, দূষিত বায়ু মানুষের শ্বাসকার্যে ব্যাঘাত ঘটায় এবং দেহে নানা রোগ সৃষ্টি করে। দূষিত বায়ুর কারণে মানবদেহে এলার্জি, কাশি, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মাথা ব্যাথা, ফুসফুসে ক্যানসার, ইত্যাদি মারাত্মক রোগ হতে পারে।

বায়ুদূষণ রোধ

বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাবের হাত থেকে বাঁচার জন্য বায়ু দূষণ রোধ করা দরকার। বায়ুদূষণ কীভাবে হয় তা মনে রাখলে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা যায়। নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে বায়ুদূষণ রোধ করা যেতে পারে।

- কালো ধোঁয়া উৎপাদন করে এমন যানবাহন ব্যবহার বন্ধ করা।
- ইটের ভাটা লোকালয় থেকে দূরে স্থাপন করা।
- কম জ্বালানি ব্যবহার হয় – এমন উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- ধূমপান না করা, বিশেষ করে অন্য মানুষের নিকটে বা বদ্ধস্থানে ধুমপান না করা।
- রান্না ঘরে বায়ু চলাচলের ভালো ব্যবস্থা তৈরি করা।
- উন্নত চুলা ব্যবহার করা।
- বনভূমি সংরক্ষণ করা।
- গাছ লাগিয়ে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করা।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. আমাদেরকে ঘিরে আছে ————।
২. অক্সিজেন আমাদের গ্রহণ করা খাদ্য ভেঙে ———— উৎপাদন করে।
৩. শ্বাসকষ্টের রোগীদের অনেক সময় সিলিন্ডার থেকে ———— দেওয়া হয়।
৪. রান্নাঘরে বিষাক্ত ———— উৎপন্ন হয়।
৫. ইউরিয়া সার প্রস্তুতিতে বায়ুর ———— গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. চিপসের প্যাকেটে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?
ক. অক্সিজেন খ. কার্বন ডাই-অক্সাইড
গ. নাইট্রোজেন ঘ. জলীয় বাষ্প

২. উঁচু পর্বতে উঠতে গেলে সিলিন্ডারে করে কোন গ্যাস নিয়ে যেতে হয়?
ক. অক্সিজেন খ. কার্বন ডাই-অক্সাইড
গ. নাইট্রোজেন ঘ. কার্বন মনোক্সাইড

৩. কোন গ্যাসটি বিষাক্ত?
ক. অক্সিজেন খ. কার্বন ডাই-অক্সাইড
গ. নাইট্রোজেন ঘ. কার্বন মনোক্সাইড

৪. জ্বালানি পোড়ালে বায়ুতে কোনটি বাড়ে?
ক. অক্সিজেন খ. কার্বন ডাই-অক্সাইড
গ. নাইট্রোজেন ঘ. নিয়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বায়ুর চারটি উপাদানের নাম লিখ।
২. এসিড বৃষ্টি কী?

৩. রান্নাঘরে বায়ু দূষণ কমানো যায় কীভাবে?
৪. ইটের ভাটার দূষণের প্রভাব কীভাবে কমানো যায়?
৫. কোথায় কোথায় বায়ু আছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বায়ু প্রবাহকে আমরা কী কী কাজে ব্যবহার করতে পারি?
২. বায়ু কীভাবে দূষিত হয় তা আলোচনা কর।
৩. বায়ুর উপাদানগুলো আমাদের বেঁচে থাকতে কীভাবে সাহায্য করে ব্যাখ্যা কর।
৪. বায়ুদূষণ রোধের উপায়গুলো লিখ।
৫. ধূমপান ক্ষতিকর কেন?

পদার্থ ও শক্তি

নিচের ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ কর। কী দেখছ?

সাইকেল চালানো

আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো

একটি মেয়ে সাইকেল চালাচ্ছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটি মেয়ে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে। তাপ পেয়ে পানি গরম হচ্ছে এবং এক সময় বাষ্পে রূপান্তরিত হচ্ছে। সাইকেলটি গতি লাভ করেছে মেয়েটির পেশি শক্তির প্রয়োগে। বিদ্যুৎ চমকানোর পেছনে তড়িৎ শক্তি কাজ করছে। হারমোনিয়াম থেকে শক্তি শব্দরূপে ভেসে আসছে। নানা রকম ঘটনা বা পরিবর্তনের আড়ালে যা দায়ী তা হলো শক্তি। আমরা বলতে পারি শক্তি হচ্ছে পরিবর্তনের সংঘটক বা এজেন্ট।

হারমোনিয়াম বাজানো

তাপে পানির দশা পরিবর্তন

প্রকৃতির নানা ঘটনার বর্ণনায় দুটি ধারণা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো পদার্থ অন্যটি হলো শক্তি। তোমরা জানো, পদার্থের ওজন আছে এবং পদার্থ জায়গা দখল করে। কিন্তু শক্তির কি ওজন আছে? শক্তি কি জায়গা দখল করে? খেয়াল কর তাপ, আলো, শব্দ, বিদ্যুৎ এগুলোর কোনো ওজন, আকার ও আয়তন নেই। কিন্তু এগুলো পদার্থের উপরে ক্রিয়া করে এবং পরিবর্তন সাধন করে। তাপ না দিলে পানি ফুটত না। শক্তি প্রয়োগ না করলে সাইকেল গতি লাভ করত না। আলো না পেলে ফসলের বৃদ্ধি ঘটত না। শব্দ শক্তির জন্যেই নিরব হারমনিয়াম সরব হয়ে উঠছে।

পদার্থ যেমন নানা রকম হতে পারে এবং নানা দশায় থাকতে পারে, তেমনি শক্তিরও নানা রূপ আছে। পদার্থকে আমরা চিনতে পারি এর মূল বৈশিষ্ট্য থেকে। এর ওজন ও স্থান দখল করা থেকে। শক্তিকেও আমরা শনাক্ত করতে পারি বস্তুর উপরের ক্রিয়া থেকে।

আমাদের সমস্ত কাজকর্ম, পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শক্তি প্রয়োজন। শক্তির যথাযথ প্রয়োগ না হলে শক্তির অপচয় ঘটে। শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। শক্তি শুধু রূপান্তরিত হয় এক দশা থেকে অন্য দশায়। এই রূপান্তরের ভিতর দিয়ে শক্তির অবনতি ঘটতে পারে। ফলে শক্তি ধ্বংস না হলেও ব্যবহারের যোগ্যতা হারায়।

শক্তি কী ?

তুমি একটি ঢিল ছুড়লে। একটি স্প্রিং টেনে লম্বা করলে। একটি ভারী বস্তুকে নিচে থেকে উপরে তুললে। পানিকে তাপ দিয়ে বাষ্প করলে। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ট্রেনটাকে টেনে নিয়ে চলল। এসবই হলো শক্তি খরচের উদাহরণ। কোনো বস্তুর গতি বৃদ্ধি করতে বা তাপমাত্রা বাড়াতে শক্তি ব্যয় করতে হয়।

একটি স্প্রিংকে টেনে লম্বা করতেও টান বা বল প্রয়োগ করতে হয়। একটি সহজ উপায়ে শক্তি খরচের পরিমাপ করতে পার। একটি স্প্রিংকে টেনে লম্বা করতে বল প্রয়োগ করতে হয়। স্প্রিংটি কতটা লম্বা করলে তাও জানলে। এই দুটো রাশির গুণফল হলো তোমার শক্তি খরচের পরিমাণ। একটি ভারী বস্তুকে উপরে তোলার সময়ও এই হিসাবটি করতে পার। কতটা ওজন তুমি কতটা উপরে তুললে, এই দুইয়ের গুণফল হলো শক্তির পরিমাণ। বল বা টান প্রয়োগ করে দূরত্ব অতিক্রম করাকে কাজ করা বলি। কাজ করার সামর্থ্যকে আমরা শক্তি বলি। শক্তির নানা উৎস ও নানা রূপ আছে। সব ধরনের শক্তিই পরিমাপ করা হয় তা কতটা কাজ করতে পারে তা জেনে। শক্তির ধারণা বেশ জটিল। কারণ, শক্তি নানা দশায় থাকে ও নানাভাবে কাজ করে। এজন্যেই শক্তিকে চেনার একটি সাধারণ উপায় হলো একে পরিবর্তনের উৎসরূপে দেখা।

শক্তির নানা রূপ

শক্তিকে আমরা সবচেয়ে সহজে অনুভব করি তাপ ও আলো রূপে। সূর্য থেকে প্রচুর তাপ ও আলো আমরা পাই প্রতিদিন। সূর্যের তাপে কৃষক ধান শুকায়, সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে মেঘ সৃষ্টি করে। সূর্যের আলোতে আমরা নানা বস্তু ও দৃশ্য দেখি। ক্যামেরায় ছবি তুলি। মাঠে মাঠে যে ফসল ফলে তা ঘটে সূর্যের আলোকে শোষণ করে নিয়ে। তোমরা জেনে থাকবে সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে বিজ্ঞানীরা। একে বলে সৌর বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ খুব প্রয়োজনীয় শক্তি আধুনিক সভ্যতায়। বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে আমরা রাতে বাতি জ্বালাই। গরমের সময় বৈদ্যুতিক পাখা চালাই। বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে শিল্পকারখানায় কাজ হয়। শব্দও এক ধরনের শক্তি। শব্দ ব্যবহার করেই আমরা কথা বলি। আমরা গান ও সঙ্গীত শুনি শব্দ শক্তির মাধ্যমে।

পালতুলে যে নৌকা চলে সেটা বায়ু প্রবাহের শক্তি ব্যবহার করে। জলস্রোতকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। আমরা যে খাবার খাই তার মধ্যে শক্তি থাকে। আমাদের দেহের সব শক্তি আসে এই খাবার থেকে।

শক্তির রূপান্তর

উপরের উদাহরণগুলোতে তুমি দেখলে শক্তির নানা রূপ ও তার প্রয়োগ। খেয়াল করো, প্রতিটি ঘটনায় শক্তির রূপান্তর ঘটছে। সূর্যের আলো শোষণ করে নিয়ে বড় হয় গাছ বা জমির ফসল। সেখানে আলোক শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে রাসায়নিক শক্তিতে। যখন কাঠ বা কয়লা পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন করা হয় তখন রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হয় তাপ শক্তিতে। জেনারেটরে কয়লা বা

তেলের রাসায়নিক শক্তি প্রথমে রূপান্তরিত হয় তাপশক্তিতে। এই তাপশক্তি রূপান্তরিত হয় গতি শক্তিতে। এই গতি শক্তি রূপান্তরিত করা হয় বিদ্যুৎ শক্তিতে। তোমরা জানো, এই বিদ্যুৎ শক্তিকে কত বিচিত্ররূপে আমরা ব্যবহার করি নানা কাজে। প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা প্রবাহ তাই শক্তির রূপান্তরের খেলা।

বলতে পার, আমাদের সভ্যতাও আসলে শক্তি ব্যবহারের নানা কৌশল উদ্ভাবন।

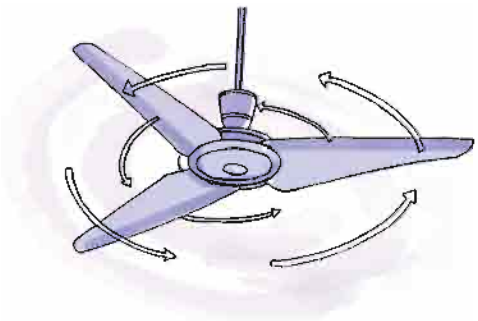

ফ্যান ঘোরা

কাপড় ইস্ত্রি করা

শক্তির উৎস

তোমরা দেখেছ নানা কাজে, নানা ঘটনায় শক্তির বিচিত্র ব্যবহার। এই শক্তি কখনো আসছে কয়লা, তেল বা খাবার থেকে। কখনো আসছে বাতাস বা পানির প্রবাহ থেকে। কখনো বৈদ্যুতিক ব্যাটারি বা জেনারেটর থেকে। সাধারণ অর্থে আমরা বলতে পারি শক্তির উৎস হলো কয়লা, তেল, গ্যাস, খাদ্য, জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ, বৈদ্যুতিক ব্যাটারি, জেনারেটর ইত্যাদি। এসব উৎস থেকেই আমরা তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, শব্দ ইত্যাদি পাচ্ছি। কিন্তু খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখবে এ সমস্ত শক্তির মূল উৎসই সূর্য। সূর্যের আলো পেয়েই উদ্ভিদ বা গাছপালা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূর্যের মধ্যে শক্তি কেমন করে তৈরি হচ্ছে সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোমার মনে জাগবে। সংক্ষেপে একে আমরা বলি নিউক্লিয়ার শক্তি। উপরের ক্লাসে এ সম্পর্কে জানতে পারবে।

তাপ সঞ্চারণের পদ্ধতি

উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রার স্থানে তাপ সঞ্চারণ ঘটে তিন পদ্ধতিতে। এগুলো হলো পরিচলন, পরিবহন ও বিকিরণ। কোনো কঠিন বস্তুর ভিতর দিয়ে তাপ সঞ্চারিত হয় পরিবহন পদ্ধতিতে। বস্তুর এক প্রান্ত উচ্চ তাপমাত্রায় থাকলে তাপ ধীরে ধীরে নিম্ন তাপমাত্রার এলাকায়

প্রবাহিত হয়। উচ্চ তাপমাত্রার অণু থেকে তাপ নিম্ন তাপের অণুতে যেতে থাকে। যা পাশের চিত্রে দেখানো হলো।

তাপের পরিবহন

তাপ সঞ্চারণের পরিচলন পদ্ধতি

একটি কাচের বিকারে পানি নাও। এবার একটি জ্বলন্ত মোমবাতির উপরে বিকারটি ধর। বিকারের উপরের পানি একটু পরে গরম হয়ে উঠবে। কী ঘটছে দেখার জন্য বিকারের মধ্যে প্রথমেই কিছু লাল বা কালো রং এর মিহি বালি কণা ছেড়ে দাও। বিকারটি গরম করার ফলে নিচের উত্তপ্ত পানি হালকা হয়ে উপড়ে উঠতে থাকবে সেই সঙ্গে বালি কণাও। উপরে উঠে একটু ঠান্ডা হলে উপরের ঠান্ডা পানি নিচে আসবে। পানির এ উঠা নামার সঙ্গে বালিকণার উঠা নামাও দেখা যাবে। পানির অণুর উঠা নামা দেখা গেলেও রঙ্গিন বালির উঠানামা থেকে স্পষ্ট যে পানির উত্তপ্ত অণু তাপ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে নিচ থেকে উপরে। এই পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চারণকে পরিচলন পদ্ধতি বলা হয়। ঘরের এক প্রান্তে হিটার জ্বালালে অন্য প্রান্তে যে বাতাস গরম হয়ে উঠে সেটাও ঘটে পরিচলন পদ্ধতিতে।

তাপের পরিচলন

বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চারণ

সূর্য থেকে আমরা তাপ ও আলো পাই কীভাবে? এক্ষেত্রে কোনো ধাতব সংযোগ নিই। পৃথিবীর চারপাশে যে বায়ুমন্ডল তা কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বের করেছেন তাপ ও আলোর তরঙ্গ শূন্য মাধ্যমেও সঞ্চারিত হতে পারে। এই পদ্ধতিকে বিকিরণ পদ্ধতি বলে।

আলোর সঞ্চারণ

আলো পরিচলন বা পরিবহন পদ্ধতিতে সঞ্চারিত হয় না। শুধু বিকিরণ পদ্ধতিতে সঞ্চারিত হয়। এর বড় প্রমাণ হলো আকাশের দূর নক্ষত্র থেকে আলো আমাদের কাছে পৌঁছে। সূর্য এবং চাঁদ

থেকে শুরু হয় আলোর তরঙ্গ যা বাতাস বা অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতর দিয়েও চলতে পারে। আসলে তাপ ও আলো যখন বিকিরণ পদ্ধতিতে সঞ্চারিত হয় তখন একই ঘটনা ঘটে।

তাপ ও আলো সঞ্চারণ নিয়ন্ত্রণ করার নানা কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। বস্তুকে গরম বা ঠান্ডা রাখার জন্য থার্মোফ্লাস্ক ব্যবহার করা হয়। এখানে তাপ পরিচলন, পরিবহন ও বিকিরণ বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়।

তোমরা জানলে, তাপ তিন পদ্ধতিতে সঞ্চারিত হয়। এগুলো হলো পরিচলন, পরিবহন ও বিকিরণ। বিকিরণ পদ্ধতিতে আলোও সঞ্চারিত হয়। এজন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। তবে স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতর দিয়েও বিকিরণ সঞ্চারিত হতে পারে।

শক্তির যথাযথ ব্যবহার

শক্তির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো একে ধবংস করা যায় না। এটা সৃষ্টিও করা যায় না। আমরা যখন শক্তি ব্যবহার করি তখন শক্তি শুধু রূপান্তরিত হয়। কয়লা, তেল বা গ্যাসের মধ্যে যে রাসায়নিক শক্তি জমা হয়ে আছে তা থেকে আমরা তাপ শক্তি উৎপন্ন করতে পারি। এই তাপ দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চলে। কখনো বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। যে কয়লা বা তেল পুড়িয়ে তাপ শক্তি তৈরি হলো, সেই তাপ শক্তি থেকে কিন্তু কয়লা বা তেল তৈরি করা যায় না। ফলে শক্তি রূপান্তরিত হবার সময় শক্তির অবনতি ঘটে। অর্থাৎ শক্তি অব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠে।

আমরা যে তেল, কয়লা, গ্যাস খরচ করছি তা ক্রমাগত ফুরিয়ে যাচ্ছে। ফলে এগুলো আমরা আর ফিরে পাব না। ফলে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া শক্তি খরচ করলে শক্তির অপচয় ঘটে। বিশ্বে শক্তির পরিমাণ বদলাবে না। কিন্তু এক সময় ব্যবহারযোগ্য শক্তি আমাদের কাছে থাকবে না। এজন্য শক্তির অপচয় বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হলে উন্নত প্রযুক্তি চাই।

পদার্থের গঠন

পদার্থ কী দিয়ে গঠিত? এর বৈশিষ্ট্য কী? এ প্রশ্ন প্রথম উত্থাপন করেন গ্রীক দার্শনিকরা। তাঁরা ধারণা দেন যে, পদার্থ ক্ষুদ্র বস্তু কণিকা দ্বারা তৈরি। এই ক্ষুদ্রতম কণিকা আর ভাঙ্গা যায় না। এর নাম দেন এটম অর্থাৎ অবিভাজ্য। আমরা একে বলি পরমাণু।

সব পদার্থ পরমাণু দিয়ে গঠিত এবং এই পরমাণু অবিভাজ্য। বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পায় তার কারণ তারা বিভিন্ন রকম পরমাণু দিয়ে গঠিত। পদার্থের বৈশিষ্ট্য আরো একটি কারণে ভিন্ন হয়। সেই কারণটি হলো, পরমাণুগুলো পদার্থের মধ্যে কীভাবে সাজানো? এদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন কেমন তা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন কয়লা ও হীরা উভয়ই কার্বন দিয়ে তৈরি। কিন্তু হীরা অনেক বেশি শক্ত। এর বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। কারণ এর মধ্যে কার্বন পরমাণু ভিন্নভাবে সাজানা এবং তাপের বন্ধন অনেক বেশি দৃঢ়।

কোন পদার্থ কোন দশায় থাকবে। অর্থাৎ তা কঠিন না তরল না গ্যাসীয় অবস্থায় থাকবে তা নির্ভর করে এদের মধ্যে পরমাণুগুলো কীভাবে সাজানো এদের মধ্যে বন্ধন কেমন তার ওপরে।

কঠিন দশায় পদার্থের পরমাণুগুলো নির্দিষ্ট অবস্থানে সাজান। এদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়। এজন্য সহজে এদের আকার বদলানো যায় না। এই আয়তনও নির্দিষ্ট থাকে।

তাপে পানির দশা পরিবর্তন

যদি পরমাণুগুলোর মধ্যে বন্ধন শিথিল হয়, পরমাণুগুলো যদি চলাচল করতে পারে, কিন্তু এদের গড় দূরত্ব ঠিক থাকে। তাহলে পদার্থটি তরল দশা লাভ করে। এই তরল অবস্থায় আকার ঠিক থাকে না কিন্তু আয়তন ঠিক থাকে। তরল পদার্থকে তাপ দিয়ে যদি এমন অবস্থায় আনা যায় যে পরমাণু মধ্যে কোন বন্ধন থাকে না। তখন এরা জায়গা দখল করে কিন্তু তা নির্দিষ্ট থাকে না।

পরমাণু এভাবে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় দশায় থাকে। যেমন তাপের ফলে বরফ গলে তরল দশায় পানি হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. বিদ্যুৎ চমকানোর পিছনে——— শক্তি কাজ করে।

খ. সাইকেল চালাতে ——— শক্তি কাজ করে।

গ. বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালালে ——— শক্তি ——— শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

ঘ. শক্তি ——— করা বা ——— করা যায় না।

ঙ. পদার্থ ——— দিয়ে গঠিত।

চ. তাপ দিলে পদার্থের ——— পরিবর্তন ঘটে।

শুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত কর

ক. আলো পরিচলন পদ্ধতিতে সঞ্চারিত হয়

খ. আলো পরিবহন পদ্ধতিতে সঞ্চারিত হয়

গ. আলো শুধু বিকিরণ পদ্ধতি সঞ্চারিত হয়

ঘ. সূর্য থেকে আমরা তাপ পাই পরিবহন পদ্ধতিতে

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশের মিল কর

বাম	ডান
চুলা	আলোক শক্তি
মোমবাতি	তাপশক্তি
ঠেলাগাড়ি	বিদ্যুৎ শক্তি
ব্যাটারি	শব্দশক্তি
	পেশি শক্তি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পদার্থের দশা পরিবর্তনের কারণ কী?

২. পদার্থ কী দিয়ে গঠিত?

৩. পাঁচ রকম শক্তির নাম লিখ।

৪. পদার্থ পরমাণু দিয়ে তৈরি এ কথা কোন বিজ্ঞানী বলেন ?

বর্ণনামূলক উত্তর দাও

১. পদার্থ বলতে কী বুঝায় ?

২. পদার্থের তিন দশার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

৩. তাপ কী কী ভাবে সঞ্চারিত হয়।

৪. শক্তির পরিমাপ করা যায় তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাও।

৫. শক্তির অপচয় ঘটে এমন ঘটনার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

শক্তি রূপান্তরের একটি চিত্র আঁক ও ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুস্থ জীবনের জন্য খাদ্য

খাদ্য কী, কেন এবং কোথা থেকে পাই?

দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যের প্রয়োজনের কথা আমরা জেনেছি। আমরা আরও জেনেছি, খাদ্যের ছয়টি উপাদান মিলে তৈরি হয় সুষম খাদ্য। এগুলো হচ্ছে শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। সুস্থ সবল দেহের জন্য সকলের সুষম খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এবারে আমরা জানব পরিমিত খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য সংরক্ষণের উপায়। এ ছাড়াও খাদ্যে কৃত্রিম রং এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ও জাঙ্ক ফুড এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলো জানবো।

পরিমিত খাদ্য কেন গ্রহণ করবো ?

দেহ সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য আমরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। আমরা ভাত খাই। এর সংগে তরকারি, মাছ বা মাংস ও ডাল থাকে। কখনও কখনও দুধ, দই, ফল ইত্যাদি থাকে। ছোট ও বড় সকলেরই সুষম খাদ্য প্রয়োজন। তবে বয়স ও কাজ করার ধরণ অনুযায়ী দেহের চাহিদা ভিন্ন হয়। অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ বা একজাতীয় খাবার গ্রহণের কারণে দেহ ভারী হয়ে পড়ে। এতে শিশুরা শারীরিক পরিশ্রম এমনকি খেলাধুলার আগ্রহও হারিয়ে ফেলে। বড়দেরও কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।

দেহের চাহিদা মিটানোর জন্য খাদ্যের ছয়টি উপাদানই পরিমাণমত দরকার। ভিটামিন ও খনিজ লবণের পরিমাণ কম হলেও দেহের চাহিদামত থাকতে হবে। আবার দেহের বিভিন্ন কাজের জন্য পানির পরিমাণ বেশি লাগে। প্রধান তিনটি খাদ্য উপাদান যেমন– শর্করা, আমিষ ও স্নেহ পদার্থ বেশি পরিমাণে লাগে। এদের প্রতিটিই খাদ্যে থাকতে হবে। কারণ এগুলো দেহের গঠন, বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ ছাড়াও তাপশক্তি যোগান দেয়।

প্রতিদিন কার কতটুকু শক্তি প্রয়োজন তা নির্ভর করে মূলত বয়স, দেহের উচ্চতা ও দেহের ওজনের ওপর। তবে যারা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে তাদের বেশি শক্তি প্রয়োজন।

খাদ্য সংরক্ষণ

খাদ্য সংরক্ষণের প্রাচীন পদ্ধতিগুলো আমরা জেনেছি। যেমন– রোদে শুকিয়ে ধান, চাল, গম ইত্যাদি সংরক্ষণ। এছাড়াও রয়েছে মাছের শুঁটকি, ফলের আচার, মোরব্বা ইত্যাদি। বিভিন্ন উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ করে আমরা পরবর্তী সময়ে সেগুলো ব্যবহার করতে পারি। এবার বলো, খাদ্য সংরক্ষণ বলতে তুমি কী বুঝ?

বাড়িতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের মুল উদ্দেশ্য কী?

- খাদ্য দ্রব্যকে পচন থেকে রক্ষা করে টাটকা ও তাজা রাখা।
- বছরের সব সময়ে যাতে সব রকমের খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা।
- পরিবারের ভবিষ্যৎ খাদ্য নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা।
- খাদ্যের অপচয় রোধ করা

কাজ: এবারে নিচের ছকটি খাতায় এঁকে তোমার বাড়িতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের একটি তালিকা তৈরি কর।

বাড়িতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা	
খাদ্য দ্রব্যের নাম	সংরক্ষণের উপায়

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের উপায়

প্রথমত, সব খাদ্যসামগ্রী বছরের সব সময় পাওয়া যায় না। আবার সব রকমের খাদ্যসামগ্রী সব দেশেও হয় না। অথচ বেশ কিছু খাদ্যসামগ্রী বছরে সব সময়ই লাগে। যেমন– চাল, আটা, আলু, মাছ–মাংস বিভিন্ন ধরনের মসলা ইত্যাদি। তাই সব দেশেই প্রায় সব ধরণের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণ করতে হয়। তাই খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও ধরণ অনুযায়ী সংরক্ষণের উপায় পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন– ধান বা চাল, গম, ডাল ইত্যাদি রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু মাছ, মাংস, তরকারি, ফল ইত্যাদিতে পানি বেশি থাকায় শুধু রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায় না। তাই এগুলো ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যায়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নানা রকমের হয়। খাদ্যের বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ ঠিক রেখে খাদ্যদ্রব্যকে উচ্চতাপে শুকানো। যেমন– মুড়ি, খই, আমসত্ত্ব ইত্যাদি। আবার খাদ্যদ্রব্য উচ্চ তাপে জীবাণু ধ্বংস করে বন্ধ পাত্রে এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। যেমন– মাছ, মাংস, সবজি, ফল ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে টমেটো সস, পনির, মাখন, ঘি সংরক্ষণ করা। বিদেশ থেকে আমদানি করা টিনজাত গুঁড়াদুধ নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো।

বরফ জমানো ঠান্ডা তাপে খাদ্যে জীবানু জন্মায় না। মাছ, মাংস, মটরশুটি, গাজর, টমেটো, ঢেঁড়স ইত্যাদি এভাবে পাঁচ–ছয় মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। ফ্রিজের ঠান্ডা তাপে সবজি, ফল ও বীজ বেশ কিছুদিন ভাল রাখা হয়।

কাজ: এবারে নিচের ছকটি খাতায় এঁকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণের একটি তালিকা তৈরি কর।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণের তালিকা	
খাদ্য দ্রব্যের নাম	সংরক্ষণের উপায় বা পদ্ধতির নাম

আজকাল হিমাগারে আলু, পিঁয়াজ, গাজর ইত্যাদি সংরক্ষণ করে বছরের বিভিন্ন সময়ে বাজারে এসবের সরবরাহ ঠিক রাখা হয়। খুব ঠান্ডায় জমিয়ে গলদা চিংড়ি সংরক্ষণ ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

বরফ দেওয়া ইলিশ

লবণ দেওয়া মাছ

তেলজাত করে খাদ্য সংরক্ষণ

এছাড়া লবণ, চিনি, সিরকা ও তেলের মধ্যে পচনকারী জীবাণু জন্মাতে পারে না। তাই এসবের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়। যেমন– নোনা ইলিশ, মাছ, জলপাই, বড়ই, মটরশুটি ইত্যাদি।

খাদ্য কৃত্রিম রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

বাড়ির বাইরে তোমরা কী কী খাবার খাও?

নিচের ছকটি খাতায় এঁকে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বাড়ির বাইরের খাবারের তালিকা		
ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	পছন্দের কারণ
০১		
০২		
০৩		
০৪		

এভাবে তৈরি তালিকাটি নিচের চিত্রে দেখান খাদ্যের সঙ্গে মিলাও। তালিকাটি শিক্ষক এবং বাবা–মাকে দেখাও। এ থেকে বুঝা যায়, রং, ঘ্রাণ ও স্বাদই এসব খাদ্য পছন্দের মূল কারণ।

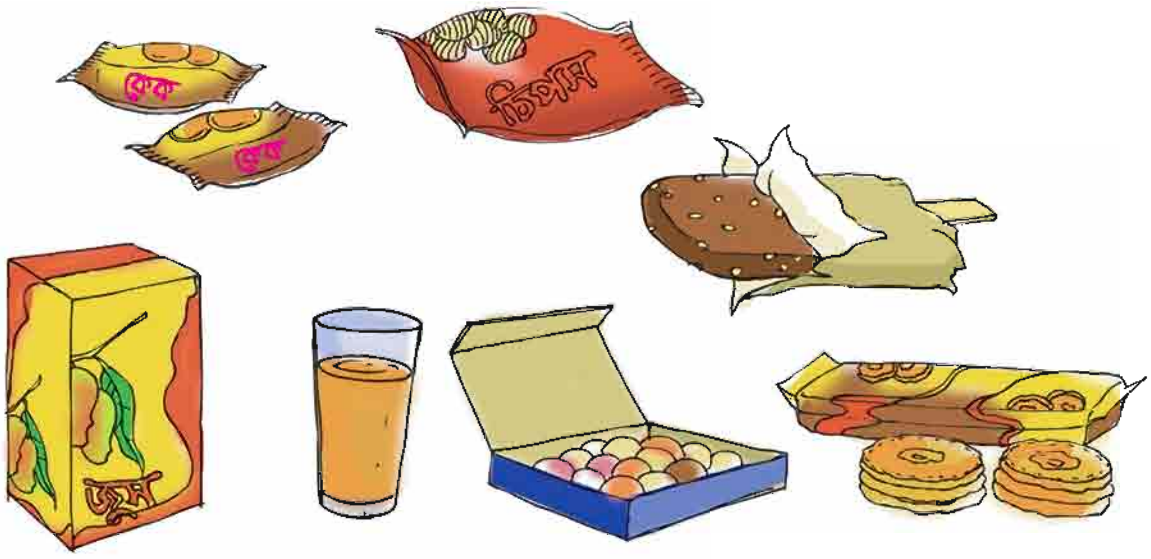

কৃত্রিম রং মিশ্রিত খাবার

উপরের চিত্রে রং ও রাসায়নিক মিশ্রিত পানীয়, সরবত, মিষ্টি, ফল, রুটি, বিস্কুট, পিঠা, চানাচুর, মসলা, শুঁটকি ইত্যাদি দেখান হয়েছে। খাদ্যদ্রব্যকে আকর্ষণীয় করার জন্যই মূলত এসবে রং ও রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এসবই খাদ্য দ্রব্যের জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

কৃত্রিম রং ও রাসায়নিক ব্যবহারের ভয়াবহতা

উপরের তালিকাটি লক্ষ কর। দেখবে, যেসব খাদ্যে কৃত্রিম রং মিশানো হয় তার মধ্যে রয়েছে মরিচ, হলুদ, চাল, ডাল, মিষ্টি, মাছ, ফল, পানীয় ইত্যাদি। যেসব রং ও দ্রব্যাদি মেশানো হয়, তার মধ্যে রয়েছে– কৃত্রিম রং, ইটের গুড়া, রঙিন কাঠের গুড়া, কাপড়ের রং, ধূলা, কৃত্রিম মিষ্টিদ্রব্য ইত্যাদি। বর্তমানে হাট–বাজারে অনেক খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো থাকে। যাতে রং ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন থেকে শুরু করে খাদ্য তৈরি, খাদ্য সংরক্ষণ, ফল পাকানো ও বাজারজাত করণে রাসায়নিক দ্রব্য মেশানে হয়। আমরা আগেই জেনেছি, অযাচিত ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক খাদ্য সামগ্রীতে প্রবেশ করে থাকে। খাদ্যে ক্যালসিয়াম কারবাইড, বিষাক্ত পাউডার, ফরমালিন ও স্যাকারিন এর মত রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হচ্ছে। এসবই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

কৃত্রিম রং ও রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে মানুষের শরীরের নানা রকম ক্ষতি হয়। এদের মধ্যে লিভার ও কিডনি অকার্যকর হওয়া, এ্যাজমা হওয়া, শরীরের বৃদ্ধি কমে যাওয়া ও ক্যান্সার রোগ হওয়া ইত্যাদি।

'জাঙ্ক ফুড' কী?

নিশ্চয়ই, তোমাদের কেউ কেউ হয়ত 'জাঙ্ক খাদ্য'–এর নাম শুনে থাকবে। বার্গার, পটেটো চিপস, চকলেট, কোমল পানীয়– লেমন ও সোডা ইত্যাদি হলো জাঙ্ক খাদ্য। বলতো, এগুলো কি সাধারণ খাদ্যের সাথে তুলনীয়? নিশ্চয়ই না।

আসলে জাঙ্কফুড হচ্ছে একধরনের কৃত্রিম খাদ্য যাতে চর্বি, লবণ, কার্বনেট ইত্যাদি ক্ষতিকারক দ্রব্যের আধিক্য থাকে। ফলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যেমন– আলুর চিপস, বার্গার, ক্যান্ডি, কোমল পানীয়, কৃত্রিম বিভিন্ন ফলের রস, চকলেট ইত্যাদি।

নানা রকমের 'জাঙ্কফুড'

এসব খাবারে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ খুব কম বা নেই বললেই চলে। উচ্চ মাত্রায় মিষ্টি যুক্ত শস্য দানা, যা বিশেষ করে শিশুদের জন্য তৈরি করা হয়, তাও জাঙ্কফুড। যেমন– ফ্রুট লুপস্।

তাৎক্ষণিকভাবে খাওয়ার জন্য জাঙ্কফুড সুবিধাজনক। যাতে উচ্চ মাত্রায় চর্বি, লবণ বা চিনি থাকে। এতে শাক–সবজি বা খাদ্য–আঁশ সামান্য থাকতে পারে। আবার নাও থাকতে পারে। যা স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও উপকারী নয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

ক. খাদ্যের ——— দেহে কাজ করার শক্তি যোগায়।

খ. তীব্র ঠাণ্ডায় খাদ্যে ——— জন্মায় না।

গ. খাদ্যে ——— ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

ঘ. ——— ফুডে খাদ্য আঁশ নেই।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. নিচের কোনটি জাঙ্কফুড ?

ক. আলুর ভর্তা
খ. রুটি
গ. পটেটো চিপস
ঘ. পরটা

২. খাদ্যে কৃত্রিম রং ও রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে

ক. দাঁত অকার্যকর হয়
খ. বাচ্চারা ভারী দেহধারী হয়
গ. লিভার ও কিডনি অকার্যকর হয়
ঘ. শিশুরা শুকিয়ে যায়

৩. নিচের কোন রাসায়নিক পদার্থ খাদ্যে ভেজাল হিসেবে মেশানো হয়?

ক. আয়োডিন
খ. ফরমালিন
গ. ক্যালসিয়াম
ঘ. কার্বোহাইড্রেট

৪. বয়স, উচ্চতা ও দেহের ওজন ছাড়া আর কী কারণে খাদ্যের মাধ্যমে বেশি তাপ শক্তি সরবরাহ করতে হয়?

ক. পড়ালেখা
খ. ঘুমানো
গ. কায়িক শ্রম
ঘ. অফিসে চাকুরি করা

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশের মিল কর

বাম	ডান
ক. খাদ্যশস্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করলে	ক. ধান, চাল, গম, ডাল ইত্যাদি
খ. খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করলে	খ. টিনজাত করলে তা এক বছর ভাল থাকে
গ. উচ্চ তাপে খাদ্যদ্রব্য ফুটিয়ে	গ. অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী করা যায়।
ঘ. রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়	ঘ. সব ঋতুতে সব ধরনের খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়।
	ঙ. ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি মিলে তৈরি হয় সুষম খাদ্য।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ বর্ণনা কর।
২. পরিমিত খাদ্য কী এবং পরিমিত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৩. জাঙ্কফুড বলতে কী বোঝানো হয়, ব্যাখ্যা কর।
৪. খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

স্বাস্থ্যবিধি

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন রোগজীবাণু ছড়িয়ে আছে। এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। বিভিন্নভাবে এসব রোগজীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। কিছু রোগজীবাণু পানির মাধ্যমে ছড়ায়। আবার কিছু রোগ আছে যেগুলোর জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। আবার কিছু রোগজীবাণু কীট–পতঙ্গের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। পানিবাহিত রোগ সম্পর্কে তোমরা তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছো। তোমরা জান, পানি ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। কিন্তু সে পানি হতে হবে নিরাপদ।

জীবনধারণে নিরাপদ পানির প্রয়োজনীয়তা

আমাদের জীবনে পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুকুর, জলাশয়, খালবিল, নদী, হ্রদ, ভূগর্ভের গভীর ও অগভীর পানির স্তর থেকে আমরা পানি পেয়ে থাকি। যা আমরা পান করি এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। পানি যদি নিরাপদ না হয় তবে এর মাধ্যমে কিছু রোগ ছড়ায়। যেমন– ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি।

পানিবাহিত রোগ ছাড়াও আরও কিছু রোগ আছে যেগুলো বায়ুর মাধ্যমে ছড়ায়। এবারে জেনে নাও বায়ুবাহিত রোগ কোনগুলো?

বায়ুবাহিত রোগ

যে সকল রোগের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় সেগুলো বায়ুবাহিত রোগ নামে পরিচিত। যেমন– সর্দিজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, হাম, ইত্যাদি।

সর্দিজ্বর হলে রোগীর কফ, থুথু মুখ বন্ধ কৌটায় ফেলে মাটিতে চাপা দিতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে । রোগীর কফ, থুথু, হাঁচি, কাশি ইত্যাদির মাধ্যমে এসব রোগের জীবাণু ছাড়ায়। সুস্থ মানুষ শ্বাস নেওয়ার সময় বাতাসের সঙ্গে ঐ জীবাণু অন্যদের শরীরে প্রবেশ করে।

তোমরা বসন্ত রোগের নাম শুনেছো। বসন্ত রোগের জীবাণুও বায়ুর মাধ্যমে ছড়ায়। বিশেষ করে বসন্তের গুটি শুকিয়ে যাওয়ার সময়। সুতরাং এ সময় রোগীর কাছের মানুষদের সতর্ক থাকতে হবে।

যক্ষ্মা প্রতিরোধের জন্য শিশুকে বিসিজি টিকা দিতে হয়। রোগীর বিছানা, থালা–বাসন, গ্লাস ইত্যাদি আলাদা রাখতে হয়। যক্ষ্মা রোগীর কফ, থুথু, হাঁচি–কাশির মাধ্যমে এর জীবাণু বাতাসে ছড়ায়। কাজেই কফ, থুথু যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না। হাঁচি–কাশির সময় মাস্ক বা রুমাল দিয়ে নাক মুখ ঢেকে রাখতে হবে। প্রয়োজনে রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। কারণ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যক্ষ্মা রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

হাঁচি, কাশির মাধ্যমে রোগ ছড়ানো

সংক্রামক রোগ

কিছু রোগ আছে যেগুলো একজন থেকে অন্যজনে ছড়ায়। এ সকল রোগের জীবাণু রোগীর কফ, থুথু, হাঁচি–কাশির মাধ্যমে ছড়ায়। সর্দিজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ সোয়াইন ফ্লু, জন্ডিস, বসন্ত, হাম, পাঁচড়া, চুলকানি ইত্যাদি সংক্রামক রোগ।

আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এবং খাদ্য, পানি এবং বায়ুর মাধ্যমেও ছড়ায়। এছাড়াও এনোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। কিউলেক্স মশার কামড়ে গোঁদ রোগ হয়।

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে হলে তুমি কী কী করবে?

কাজ: ১. এ বিষয়ে শ্রেণিতে তোমার সহপাঠীদের সাথে দলে আলোচনা কর।
২. আলোচনা শেষে পোস্টার কাগজে লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। এজন্য আমাদের নিয়মিত দাঁত মাজা, নখ কাটা, হাত ধোওয়া ও গোসল করা উচিত। এ ছাড়া জামা–কাপড়, বালিশ, বিছানা, চাদর ইত্যাদিও পরিষ্কার রাখতে হবে।

সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে যেখানে সেখানে কফ, থুথু ইত্যাদি ফেলবে না। হাঁচি, কাশি হলে মুখে হাত বা রুমাল দিয়ে ঢাকতে হবে।

হাঁচি কাশির সময় মুখে রুমাল দেয়া

সোয়াইন ফ্লু

এইচ ওয়ান এন ওয়ান ($H_1 N_1$) নামক এক ধরনের ভাইরাসের কারণে সোয়াইন ফ্লু হয়। আক্রান্ত পশুপাখির সংস্পর্শে এলে বা অল্প সিদ্ধ মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষ আক্রান্ত হয়।

সোয়াইন ফ্লুর লক্ষণ

যদি কারো জ্বর ১০৪° ফারেনহাইটের ওপরে হয় এবং সাথে নিচের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় তবে বুঝতে হবে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছে:

- অস্বাভাবিক অবসাদগ্রস্ততা
- মাথাব্যথা
- নাক দিয়ে পানি পড়া
- গলা খুসখুস করা
- ঘনঘন শ্বাস–প্রশ্বাস অথবা কাশি থাকা
- ক্ষুধা কম হওয়া
- মাংসপেশী ও গিঁটে ব্যথা হওয়া
- ডায়রিয়া অথবা বমি হওয়া

সোয়াইন ফ্লু হলে করণীয়

সোয়াইন ফ্লুর লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। প্রচুর পানি পান করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ মতো ওষুধ খেতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা কোনো কিছু যেমন কম্পিউটার, টেলিফোন, টেবিল ইত্যাদি স্পর্শ করা যাবে না। বারে বারে হাত ভালো করে ধুতে হবে।

ডেংগু জ্বরের লক্ষণ ও চিকিৎসা

কেউ ডেংগু জ্বরে আক্রান্ত হলে তার শরীরে জ্বর থাকবে, মাথা ব্যথা করবে, শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ফুলে উঠবে, বমি হবে। ডেংগু জ্বরে কেউ আক্রান্ত হলে ঠিকমত খাবার খেতে হবে এবং সাথে প্রচুর পানি পান করতে হবে। প্রয়োজনে স্যালাইন দিতে হবে। জরুরিভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায়

যেহেতু ডেঙ্গুর কোন প্রতিষেধক বের হয় নি সেজন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হলে এডিস মশার আবাসস্থল, যেমন– কোন ভাঙ্গা দ্রব্যাদি, ফুলের টব, টায়ার ইত্যাদিতে পানি জমতে দেওয়া যাবে না। কারণ এসব পানিতে এডিস মশা বংশবৃদ্ধি করে। এডিস মশা সাধারণত সকাল এবং সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

এডিস মশা

বাতজ্বর

বাতজ্বরের কথা তোমরা অনেকেই শুনেছ। শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হয় বেশি। সাধারণত অস্বাস্থ্যকর, স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘরে বহুদিন ধরে বাস করলে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ রোগের কারণ হলো স্ট্রেপটোকক্কাস নামক এক ধরনের জীবাণু।

বাতজ্বর রোগের লক্ষণ

- ঘন ঘন জ্বর ও গলা ব্যথা হয়
- দেহের ওজন কমতে থাকে
- হাত বা পায়ের গিঁটে ব্যথা হয়
- মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা হয়

প্রতিকার

বাতজ্বরের লক্ষণ দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। রোগীর রক্ত ও লালা পরীক্ষা করে এ রোগের সংক্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। সময়মতো পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করলে এ রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। এ রোগের চিকিৎসায় অবহেলা করলে হৃৎপিন্ডের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

বয়ঃসন্ধিকাল ও বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তারপর থেকে সে ধীরে ধীরে বড় হয়। শিশুর জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তার শৈশবকাল। সাধারণত ছয় বছর বয়সের পরে মেয়ে শিশুকে বলা হয় বালিকা। ছেলে শিশুকে বলা হয় বালক। ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত বয়স হলো বাল্যকাল। দশ বছরের পর থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়টা হলো ছেলেদের ও মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয় আট থেকে তের বছর বয়সের মধ্যে। ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকাল শুরুর বয়স দশ থেকে পনের বছর। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে এর চেয়ে আগে বা পরেও বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হতে পারে। তুমি এখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছো। তোমাদের মধ্যে কারো কারো বয়ঃসন্ধিকাল চলছে।

বয়ঃসন্ধিকালে কী কী পরিবর্তন ঘটে?

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক ও আচরণের পরিবর্তন দেখা যায়। এ সময় ছেলে ও মেয়েরা দ্রুত লম্বা হয়। ওজন বৃদ্ধি পায়। ছেলেদের ক্ষেত্রে গলার স্বরের পরিবর্তন হয়। বয়ঃসন্ধিকালে সকল ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। শুধু তাই নয়, এ সময় তারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করার চেষ্টা করে।

বয়ঃসন্ধিকালে অনেক ছেলে ও মেয়ে তাদের শারীরিক পরিবর্তন দেখে ঘাবড়ে যায়। এতে ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। দুশ্চিন্তায় না পড়ে এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের মা, বাবা, বড় ভাই বোন এদের সাথে আলোচনা করবে। বয়ঃসন্ধিকাল সবার জীবনেই আসে। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। সুতরাং এ ধরনের পরিবর্তনে দুশ্চিন্তা না করে পড়ালেখাসহ স্বাভাবিক কাজকর্ম করবে।

বয়ঃসন্ধিকালে কীভাবে তুমি তোমার শরীরের যত্ন নিবে?

কাজ: ১. শরীরের যত্ন নেওয়ার বিভিন্ন উপায় তোমার খাতায় লিখ।
২. শ্রেণিতে আলোচনা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. সকল উৎসের পানি ————— নয়।
খ. ————— সুস্থ রাখার জন্য নিরাপদ পানি প্রয়োজন।
গ. বসন্ত রোগের জীবাণু ————— মাধ্যমে ছড়ায়।
ঘ. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন ————— পরিবর্তন ঘটে।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. হাম, বসন্ত ইত্যাদি রোগ কীসের মাধ্যমে ছড়ায় ?
ক. পানি
খ. বায়ু
গ. মশা
ঘ. খাদ্য

২. নিচের কোনটি সোয়াইন ফ্লুর লক্ষণ?
ক. নাক দিয়ে পানি পড়বে।
খ. ক্ষুধা বুদ্ধি পাবে।
গ. শরীরে ঘাম হবে।
ঘ. চুলকানি হবে।

৩. বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনের সময় ছেলে মেয়েদের মধ্যে নিচের কোনটি ঘটে?
ক. সবার সাথে বন্ধুভাবাপন্ন হয়।
খ. লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী হয়।
গ. প্রতিদিন স্কুলে যেতে পছন্দ করে।
ঘ. শারীরিক, মানসিক ও আচরণের পরিবর্তন হয়।

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশের মিল কর।

বাম	ডান
ক্ষতিকর রোগ জীবাণু নেই	বায়ুবাহিত রোগ
সর্দিজ্বর, হাম	রোগজীবাণু
সংক্রামক রোগের কারণ	বি সি জি টিকা
যক্ষ্মা	স্বাভাবিক
বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন	ভাইরাস জনিত রোগ
সোয়াইন ফ্লু	নিরাপদ পানি

সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. কীভাবে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করবে?
২. ডেংগু কীভাবে ছড়ায়?
৩. ডেংগু প্রতিরোধে কী কী করবে?
৪. সোয়াইন ফ্লু সম্পর্কে কীভাবে তুমি তোমার এলাকায় সচেতনতা সৃষ্টি করবে তার দুটো উপায় লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সংক্রামক রোগ কী ? সংক্রামক রোগ কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়– তা উল্লেখ কর।
২. বয়ঃসন্ধিকাল কী? এ সময়ে কী কী পরিবর্তন ঘটে?

কাজ: নিচের ছকটি পোস্টার পেপারে তুলে নাও ও তা পূরণ করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন কর।

কয়েকটি রোগের নাম	পানিবাহিত রোগ	বায়ুবাহিত রোগ	পোকমাকড় বাহিত রোগ
আমাশয়, ডায়রিয়া, সর্দিজ্বর, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, যক্ষ্মা, হাম, ডেংগু, গোদ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সোয়াইন ফ্লু			

অষ্টম অধ্যায়

মহাবিশ্ব

তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় সবচেয়ে বড় কোনো জিনিসের উদাহরণ দাও, তুমি কী বলবে? তুমি কি তোমার দেখা সবচেয়ে বড় দালানের কথা বলবে? হিমালয় পর্বতের উদাহরণ দেবে? পৃথিবীর অথবা সূর্যের কথা বলবে? আসলে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সবচেয়ে বড় হচ্ছে মহাবিশ্ব। চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ, নানা বস্তু নিয়ে আমাদের সৌরজগৎ। এই বিশাল সৌরজগৎ মহাবিশ্বের একটি সদস্যমাত্র। সূর্যের মতো অনেক নক্ষত্র মিলে যে বিশাল এক একটি সমাবেশ তাকে বলে গ্যালাক্সি। আমাদের সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সির সদস্য তাকে তোমরা ছায়াপথ বলে জান। আমাদের সূর্য যেমন একটি নক্ষত্র, এমন অসংখ্য নক্ষত্র আছে ছায়াপথে। আমরা মহাবিশ্ব কাকে বলব? বিপুল সংখ্যক গ্যালাক্সি এবং এদের মধ্যবর্তী স্থান মিলে মহাবিশ্ব। মহাবিশ্ব কত বড় তা জানতে বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা ও পরিমাপ করেছেন। সে সব জটিল বিষয় উপরের ক্লাসে জানতে পারবে। কিন্তু মহাবিশ্ব যে কত বিপুল তার একটি ধারণা তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ।

বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে কীভাবে জানলেন ?

মানুষ সবসময় বিস্ময় প্রকাশ করেছে তার চারপাশের নানা বস্তু ও ঘটনা নিয়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ অনুভব করেছে আকাশের উজ্জ্বল সব বস্তু নিয়ে এবং পৃথিবী নিয়ে। তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে সূর্য কী? চাঁদ কী? রাতের আকাশে দেখা আলোর বিন্দুগুলো কী? সূর্য ও চাঁদ কেন পূর্বদিকে উদয় হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়? দিন রাত্রি কেন হয়? ঋতু পরিবর্তন হয় কেন? অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা এখন জানি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কেমন করে এসব ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেলেন সেটাও আমরা জানতে চাই। সে ক্ষেত্রে তুমি নিজেও একজন বিজ্ঞানীর মতো অংশ নিতে পার প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে।

বিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি

বিজ্ঞান চর্চার নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার যে মূল লক্ষ্য তা অর্জনে নানা কৌশল বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন। সফল সে সব কৌশলকেই আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে পারি। বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হলো প্রকৃতির নানা বস্তু ও ঘটনার বৈশিষ্ট্য জানা, এদের মধ্যে সম্পর্ক উদ্ঘাটন এবং প্রকৃতির নিয়মগুলো আবিষ্কার করা। এর প্রধান উপায় হলো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা। দীর্ঘদিন মানুষের কাছে কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ছিল না। যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। যেমন টেলিস্কোপ বা দূরবীণ ব্যবহার করে গ্যালিলিও চাঁদ, সূর্য ও গ্রহদের সম্পর্কে নতুন তথ্য উদ্ভাবন করেন।

মাইক্রোস্কোপ বা অনুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করে খালি চোখে দেখা যায় না এমন অতি ক্ষুদ্র জীব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন। তথ্য উদ্ভাবনের মত যন্ত্র উদ্ভাবন ও ব্যবহার বিজ্ঞান চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো নানা ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক উদ্ঘাটন। এজন্য মডেল বা চিত্র কল্পনা করতে হয়। যেমন, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কেন হয় তার সহজ ব্যাখ্যা ছিল সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যারূপে কোপার্নিকাস মডেল দিলেন যে পৃথিবী এর অক্ষের উপরে পাক খায়। ফলে, দিন–রাত্রি হয়। উদ্ভাবনী চিন্তা ও সৃজনশীলতা ছাড়া মডেল করা বা তত্ত্ব সৃষ্টি করা যায় না।

টেলিস্কোপ

বিজ্ঞান অনেক ঘটনার পূর্বাভাস এবং পুরানো ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে। যদি পরীক্ষার ফল পূর্বাভাসের সঙ্গে মিলে যায় তা হলে তত্ত্বটি সমর্থন পায়। যদি তা না মেলে, তত্ত্বটি সংশোধন করতে হয় অথবা বর্জন করতে হয়। এমনি করে ধাপে ধাপে একটি শুদ্ধতর তত্ত্বের দিকে আমরা অগ্রসর হই। বিজ্ঞানের চর্চা তাই একটি অভিযান বিশ্ব রহস্য উদ্ঘাটনের। এখানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তত্ত্ব উদ্ভাবনও গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান চর্চায় প্রেরণা, প্রশ্ন উথাপন, উদ্ভাবনী দৃষ্টি ও তত্ত্ব সৃষ্টি একই সঙ্গে তাই প্রয়োজন।

মহাকাশের নানা বস্তু

মহাবিশ্বের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেন বলতো? সূর্য আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। এখান থেকেই আমরা তাপ ও আলো পাই। সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী নানা গতি লাভ করেছে। সূর্য থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় সব শক্তি পাচ্ছি এবং দিনরাত্রির পরিবর্তন ঘটছে সূর্যের জন্য। এক কথায় পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে সূর্যের জন্য। সূর্য একটি বিশাল গ্যাসপিণ্ড। উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত । এখানে প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস আছে।

পৃথিবী আমাদের সৌর জগতের আটটি গ্রহের একটি হলেও এটি ভিন্ন ও অনন্য। কারণ, এখানেই শুধু জীবন সম্ভব হয়েছে। ভেবে দেখ, পৃথিবীর অনন্য বৈশিষ্ট্য যথা বায়ুমন্ডল, বিশেষ তাপমাত্রা, দিনরাত্রির পরিবর্তন, পানি, মাটি ও সার্বিক আবহাওয়া নিয়ে জীবন সম্ভব করেছে বলে আমরা আছি।

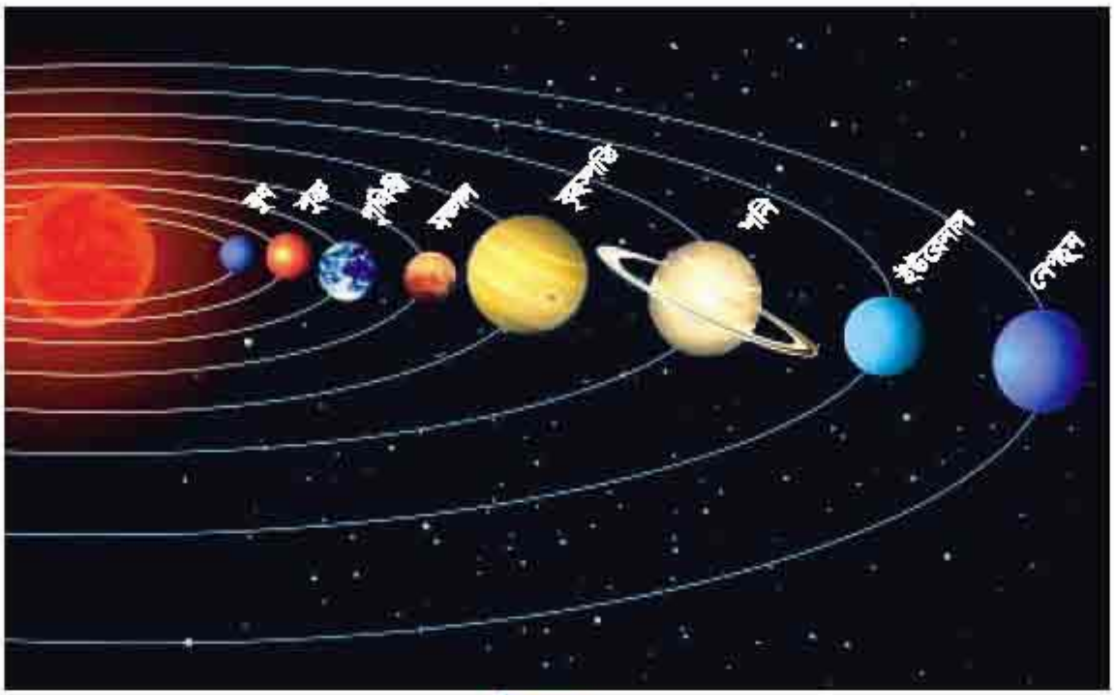

সৌরজগৎ

মানুষের উদ্ভব না ঘটলে মহাবিশ্বের রহস্য থাকত অনুদ্ঘাটিত। মানুষ এক সময় প্রশ্ন করেছে, চাঁদ কী? এটি কি পৃথিবীর মতো অথবা সূর্যের মতো? এটি কত বড়? এর কি সূর্যের মত নিজস্ব আলো আছে ?

তারাখসা

চাঁদ আসলে পৃথিবীর মত কঠিন এক গোলক। কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। আয়তনে চাঁদ পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। সূর্যের তুলনায় চাঁদ আরো অনেক বেশি ছোট। তাহলে চাঁদকে দেখতে সূর্যের সমান মনে হয় কেন? চাঁদের নিজের আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের উপর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছে।

পৃথিবীর তুলনায় চাঁদ কতটা ছোট দেখার কথা? চাঁদের নিজস্ব আলো না থাকলেও তা কেন উজ্জ্বল দেখায়? চাঁদ সূর্য থেকে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও কেন আমাদের কাছে এরা সমান দেখায়? এ তিনটি বিষয় কাজের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে।

কাজ:

১. পৃথিবী ও চাঁদের আকার তুলনা করার জন্য কিছু কাদামাটি নাও। একে সমান দুই ভাগ কর। এক ভাগ দিয়ে একটি বল তৈরি কর। অন্য কাদাটুকু দিয়ে সমান পঞ্চাশটি বল তৈরি কর। বড় বলটিকে এবার পৃথিবী মনে করলে ছোট একটি বলকে চাঁদের সমান ভাবতে পার।

২. চাঁদ কেন উজ্জ্বল দেখায় তা প্রদর্শন করতে অন্ধকার ঘরে একটি গোলক বা সাদা বল হাতে ধর। এবার বলের উপরে টর্চ বা মোমবাতি থেকে আলো ফেলো। বলের যে পাশটায় আলো পড়বে তা আলোকিত মনে হবে।

৩. সূর্য ও চাঁদ ভিন্ন মাপের হলেও এদের সমান দেখা যায় । এসো পরীক্ষা করে দেখি।

পরীক্ষণ

চাঁদের তুলনায় সূর্য যে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে তা তোমরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে পার। একজন একটি ফুটবল ও অন্যজন একটি ক্রিকেট বল নাও। একজন দর্শক টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে এমনভাবে যে ছোট বলটি তার কাছ থেকে নিকটে থাকে এবং বড় বলটি দূরে থাকে। দর্শকের কাছ থেকে দুটি বলের দূরত্ব এমনভাবে নির্ধারণ কর যাতে আলো ফেললে দুটি বলই সমান দেখায়। আসলে সূর্য ও চাঁদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে এমন যে, চাঁদ ও সূর্যকে পৃথিবী থেকে সমান দেখায়।

পৃথিবীর নানা গতি

প্রাচীন কালে মনে করা হতো পৃথিবী স্থির। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আকাশের জ্যোতিষ্কগুলো ঘুরছে। আমরা এখন জানি পৃথিবী মোটেও স্থির নয়। পৃথিবীর অনেকগুলো গতি আছে। এর মধ্যে কিছু গতি বেশ জটিল। আমরা এখানে পৃথিবীর দুটো গতি নিয়ে আলোচনা করব। একটি হলো আহ্নিক গতি অন্যটি বার্ষিক গতি।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি

পৃথিবী আপন অক্ষের ওপরে দিনে একবার পাক খায়। পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় দিন ও রাত্রি হয় এই আহ্নিক গতির ফলে।

পৃথিবীর যে দিকটা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে সেই দিকটায় দিন হয় এবং যে দিকটা উল্টোদিকে থাকে অর্থাৎ ছায়ায় পড়ে, সেদিকটায় রাত্রি হয়। অন্ধকার ঘরে একটি বাতি জ্বালাও। একটি ভূগোলক বা বলকে কিছুটা দূরে হাতে ধরে ঘুরাও। ভূগোলকের যে পাশে আলো পড়বে সে অংশে দিন হচ্ছে এবং যে অংশে আলো পড়ছে না সেখানে রাত্রি হচ্ছে।

দিন রাত্রির পরীক্ষা

পরীক্ষা : একটি গ্লোব ও টর্চ/মোমবাতি ব্যবহার করে শিক্ষকের সহায়তায় দিন ও রাত হওয়ার পরীক্ষাটি কর।

পৃথিবীর বার্ষিক গতি

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার চক্রাকারে ঘুরে আসে। আকাশে নক্ষত্রদের গড় অবস্থান দেখে এই হিসাবটি করা হয়। যে পথে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তা বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার। এর ফলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কখনো কমে, কখনো একটু বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে যে ঋতু পরিবর্তন ঘটে তা অবশ্য এই পার্থক্যের জন্য নয়। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এক পাশে একটু হেলে। ফলে পৃথিবীর মেরুরেখাটি কক্ষের সঙ্গে ৬৬ ডিগ্রি কোণ করে আছে।

ঋতু পরিবর্তন

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় পৃথিবীর অক্ষের হেলানো অবস্থা ঋতু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ যখন সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে তখন সূর্য রশ্মি অপেক্ষাকৃত খাড়াভাবে এসে পড়ে এই গোলার্ধে। সূর্য থেকে বেশি পরিমাণ বিকিরণ রশ্মি এই গোলার্ধে এসে পড়ে প্রতি একক এলাকায়। এছাড়া পৃথিবী যখন আপন অক্ষের ওপরে ঘুরতে থাকে, এই গোলার্ধের এলাকা বেশিক্ষণ ধরে সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। অর্থাৎ সে সময় উত্তর গোলার্ধে দিন হয় বড় এবং রাত্রি হয় ছোট। এই সময়টা হচ্ছে উত্তর গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল। বেশিক্ষণ ধরে সূর্য রশ্মি পায় বলে এই গোলার্ধের তাপমাত্রা তখন বৃদ্ধি পায়। এই সময় দক্ষিণ গোলার্ধে উল্টো ব্যাপারটি ঘটে বলে সেখানে হয় শীতকাল। এটা লক্ষণীয় যে, উত্তর গোলার্ধে যখন শীত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গরম, তখন পৃথিবী এর কক্ষপথে সূর্যের নিকটতম থাকে। অর্থাৎ বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে আমরা সূর্যের নিকটতম থাকি।

চাঁদের দশা ও অবস্থার পরিবর্তন

তুমি কি প্রতি রাতে আকাশের চাঁদ দেখ? চাঁদ কি সব সময় এক রকম দেখায়? খেয়াল করো কখন চাঁদকে বড় দেখায়, পূর্ণিমা উজ্জ্বল থালার মতো। কখনো অর্ধেক থালার মতো। কখনো ধনুকের মতো। চাঁদের আকার এমন বদলায় কেন?

চাঁদের বিভিন্ন দশা

সূর্যের আলো একসঙ্গে চাঁদের অর্ধেকটা আলোকিত করে। বাকী অর্ধেকটা অন্ধকারে থাকে।

চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার ফলে কখনো কখনো আমরা চাঁদের আলোকিত অংশের সবটাই দেখতে পাই। কখনো আবার আলোকিত অর্ধেক গোলকের অংশবিশেষ দেখতে পাই। সেই সঙ্গে অন্ধকারে থাকা অর্ধাংশের অংশবিশেষ দেখতে পাই। এর ফলে চাঁদের অন্ধকার অংশ কখনো কখনো পৃথিবীর দিকে থাকে। চাঁদ পৃথিবীর চার দিকে ঘুরে। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় চাঁদ,

পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চলে আসে। এতে আমরা অমাবস্যা দেখতে পাই। কিন্তু চাঁদ পৃথিবীকে প্রদিক্ষণ করার পরবর্তী পর্যায়ে এর আলোকিত অংশের অংশবিশেষ পৃথিবীর দিকে চলে আসে। আমরা তখন ফালি চাঁদ দেখতে পাই। এই পরিবর্তনটি পর্যায়ক্রমে ঘটে ফলে ২৯ $\frac{১}{২}$ দিন পর চাঁদ যখন এর পরিক্রমা শেষ করে তখন চন্দ্রমাস পূর্ণ হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পুরণ কর।

১. ছায়াপথে অসংখ্য ——— আছে ।
২. বিপুল সংখ্যক গ্যালক্সি ও এদের মধ্যবর্তী স্থান মিলে ——— ।
৩. বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো নানা ঘটনার মধ্যে ——— উদ্ঘাটন।
৪. তত্ত্ব সৃষ্টি করতে ———চিন্তা প্রয়োজন।
৫. চাঁদের নিজস্ব ——— নেই।
৬. বাংলাদেশে শীতকালে আমরা সূর্যের ——— থাকি।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

১। শুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত কর

ক. চাঁদ একটি নক্ষত্র
খ. চাঁদ একটি উপগ্রহ
গ. চাঁদ একটি গ্রহ
ঘ. চাঁদ একটি গ্রহাণু

২। দিন রাত্রির কারণ হলো–

ক. পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরে
খ. সূর্য উদয় হয় ও অস্ত যায়
গ. পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপরে পাক খায়
ঘ. চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে

৩। ঋতু পরিবর্তন হয় কখন?

ক. পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য
খ. পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য
গ. পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার বলে
ঘ. সূর্যের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে বলে

৪। কোনটি সৌরজগতের বস্তু নয়?

ক. পৃথিবী
খ. ধূমকেতু
গ. গ্যালাক্সি
ঘ. চাঁদ

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশের মিল কর

বাম	ডান
চাঁদ	নক্ষত্র
পৃথিবী	উপগ্রহ
সূর্য	গ্রহ
ঋতু পরিবর্তন	আহ্নিক গতি
	বার্ষিক গতি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নক্ষত্র কাকে বলে?
২. গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য কী?
৩. গ্যালাক্সি কাকে বলে?
৪. দিন ও রাত্রি কেন হয়?
৫. চাঁদ ও সূর্য সমান দেখায় কেন?
৬. আহ্নিক গতি কাকে বলে?
৭. ঋতু পরিবর্তনের কারণ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মহাবিশ্ব সম্পর্কে তোমার ধারণা লিখ।
২. সূর্য নক্ষত্রের বৈশিষ্ট্য লিখ।
৩. চিত্রসহ দিন রাত্রির কারণ ব্যাখ্যা কর।
৪. ঋতু পরিবর্তন কেন হয়?
৫. সৌরজগতের সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধর।
৬. সৌরজগতের একটি মডেল তৈরি কর।
৭. পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের মডেল ব্যবহার করে চাঁদের দশা পরিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রদর্শন কর।

নবম অধ্যায়

আমাদের জীবনে প্রযুক্তি

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, অন্য সব প্রাণী থেকে মানুষের জীবনধারা ভিন্ন। এই ভিন্নতার একটি প্রধান কারণ মানুষ তার প্রয়োজন মেটাতে ও উন্নততর জীবনের জন্য নানা হাতিয়ার ও কলাকৌশল ব্যবহার করে। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে ও সমস্যা সমাধানে যেসব যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার মানুষ উদ্ভাবন করেছে ও ব্যবহার করছে তা হলো প্রযুক্তি।

গাছ থেকে যদি কেউ বসার চেয়ার তৈরি করতে চায় তাহলে গাছকে কাটতে হবে। কাঠকে বিশেষ আকার দিতে হবে। এজন্য হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে। কাঠের টুকরোগুলো সংযুক্ত করে চেয়ারে রূপ দিতে লোহার পেরেক, আঠা এবং কৌশল প্রয়োগ প্রয়োজন হবে। এ সমস্ত আয়োজনই প্রযুক্তি। আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে নানা ক্ষেত্রে আমরা বস্তু ও শক্তির রূপান্তর ঘটাচ্ছি।

কাজ: তুমি কী কী যন্ত্রপাতি ব্যবহার কর তার একটি তালিকা তৈরি কর।

দৈনন্দিন ব্যবহারের যন্ত্রপাতি	কী কাজে ব্যবহার হয়

দীর্ঘদিন ধরে নানা উদ্ভাবনের ভিতর দিয়ে প্রযুক্তির অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এখন থেকে প্রায় বিশলক্ষ বছর আগে মানুষ পাথর ঘষে অস্ত্র বানিয়েছে। আগুন জ্বালানো ও আগুন নিয়ন্ত্রণ শিখেছে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। দশ হাজার বছর আগে খাদ্য উৎপাদন, পশুপালন ও গৃহনির্মাণ করে সামাজিক জীবন শুরু করেছে। চাকা আবিষ্কার, পথঘাট তৈরি, যানবাহন উদ্ভাবন, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। ভেবে দেখ, চাকা না থাকলে রাস্তা দিয়ে ভারী জিনিস বহন করা বা দ্রুত দূরত্ব অতিক্রম করা কি সম্ভব হতো?

কাজ : আমাদের দেশে কৃষকরা ব্যবহার করেন এমন প্রযুক্তিগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর এবং এগুলোর ব্যবহার উল্লেখ কর।

প্রযুক্তির বিকাশ

ঘড়ি

সভ্যতার যত অগ্রগতি ঘটছে ততই নতুন নতুন প্রযুক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তি বদলে যাচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে। আগে পৃথিবীতে জনসংখ্যা কম ছিল। মানুষ তখন কুঁড়ে ঘরে বাস করত। পায়ে হেঁটে বা গরুরগাড়ি ও ঘোড়ারগাড়ি চড়ে পথ চলত। কিন্তু এখন শহরে বহুলোক এক সঙ্গে বাস করে। এজন্য বহুতল দালান প্রয়োজন। এদের চলাচলের জন্য প্রয়োজন বাস ও ট্রেন। ভেবে দেখ, বহুতল দালান তৈরির এবং ট্রেন ও বাস নির্মাণের প্রযুক্তি ছাড়া শহরে বসবাস করা কি সম্ভব?

আধুনিক সভ্যতায় সময় মেনে চলা খুব জরুরি। ঠিক সময়ে স্কুলে যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে উপস্থিত হওয়া, ট্রেন ধরতে ঠিক সময়ে স্টেশনে পৌঁছানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘড়ি উদ্ভাবিত না হলে সময় মেনে চলা সম্ভব হতো না। আধুনিক অনেক প্রযুক্তির কথা তুমি বলতে পারো যা দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে মাত্র কয়েকশ বছরে। প্রধানত গত একশ বছরে। এর মধ্যে রয়েছে রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, কম্পিউটার, অভিনব সব কৃষিযন্ত্র, চিকিৎসা যন্ত্র ও গবেষণা যন্ত্র। প্রশ্ন করতে পার এসব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবার পিছনে কী কারণ কাজ করেছে? একটি সহজ উত্তর হলো প্রয়োজন বোধ। সমস্যা সমাধান ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি প্রেরণা কাজ করেছে। এজন্য বলা হয়ে থাকে প্রয়োজনবোধ উদ্ভাবনের উৎস।

প্রযুক্তির প্রভাব

প্রযুক্তি কীভাবে তোমার জীবনকে প্রভাবিত করেছে তা খেয়াল করো। সকালে ঘুম থেকে উঠে শৌচাগার ব্যবহার কর। গোসলের সময় সাবান ব্যবহার কর। রান্না করা খাবার খাও। ঘড়ি দেখে স্কুলে যাও। স্কুল দূরে হলে সাইকেল বা বাস ব্যবহার কর। পড়ার টেবিলে রাত্রে বাতি জ্বালিয়ে বই পড়। কলম ব্যবহার করে খাতায় লেখ। জ্বর হলে থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপ। চিকিৎসার জন্য ওষুধ সেবন কর। রেডিওতে খবর শোন। এসমস্ত কাজে নানা প্রযুক্তি তুমি শুধু ব্যবহার করছো তা না, ব্যবহৃত এসব প্রযুক্তি তোমার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে। আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় বিস্ময় হলো তথ্যপ্রযুক্তি। এ সম্পর্কে আমরা পরের অধ্যায়ে বিশেষভাবে জানব।

আমাদের প্রয়োজনবোধ ও সমস্যা সমাধানের ইচ্ছা প্রযুক্তির উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করেছে। সেই সঙ্গে উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তি আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছে। আমরা কী খাবার খাব?

কেমন গৃহে বাস করব? কী পোষাক পরব? কোন যানবাহনে দূরত্ব অতিক্রম করব? কতটা সময় মেনে চলব? কীভাবে তথ্য আদান প্রদান করব? অসুখ হলে চিকিৎসা পাব কিনা। এসব কিছু নির্ভর করছে – কোন কোন প্রযুক্তি আমাদের চারপাশে আছে? আমাদের জীবন, প্রত্যাশা, দুর্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সবকিছুর জন্য আমরা প্রযুক্তির ওপরে নির্ভরশীল। প্রযুক্তি আমাদের সমগ্র জীবনধারাকে প্রভাবিত করে।

কাজ : তোমার জানামতে দৈনন্দিন জীবনে, শিক্ষায়, চিকিৎসায় যে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তা অনুসন্ধান করে নিচের ছকে সাজাও।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি	শিক্ষায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি	চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক আগে এত গভীর ছিল না। প্রাচীন কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয় ভিন্ন দুই লক্ষ্যে। বিজ্ঞানের ভিত্তি ছিল অনুসন্ধিৎসা। অর্থাৎ জানার ইচ্ছা। প্রকৃতির নানা বস্তু ও ঘটনার বৈশিষ্ট্য জানা। নানা ঘটনার কারণ উদ্ভাবন ও বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক সন্ধান। প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। এজন্য অভিজ্ঞতা অর্জন, নানা ধারণা সৃষ্টি, যুক্তি প্রয়োগ, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু সরাসরি বাস্তব সমস্যার সমাধান ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য ছিল না।

অন্যদিকে প্রযুক্তি ছিল হাতিয়ার নির্মাণ ও নানা কলাকৌশল উদ্ভাবন করে বাস্তব সমস্যার সমাধান করা। মূল লক্ষ্য ছিল পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রথম দিকে যেসব যন্ত্র ও হাতিয়ার মানুষ উদ্ভাবন করেছে তা ছিল অন্ধ পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল। হঠাৎ করে কখনো কখনো একটি কৌশল তাঁরা পেয়ে গেছেন। কোনো পূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে উদ্ভাবন সম্ভব ছিল না।

দীর্ঘ সময় ধরে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে প্রকৃতির নিয়মগুলো গভীরতর রূপে জানতে পারেন বিজ্ঞানীরা। এই সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয়। খেয়াল করো, বিজ্ঞানের কাজ হলো প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করা। কারণ প্রযুক্তি কাজ করে প্রকৃতির এই নিয়ম অনুসারে। ফলে সচেতনভাবে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে প্রকৃতির নিয়ম মানতে হবে। একজন বিজ্ঞানী ও একজন প্রযুক্তিবিদ আসলে ভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করেন। একজন প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করেন। অন্যজন এই নিয়ম প্রয়োগ করে যন্ত্র উদ্ভাবন করেন ও বাস্তব সমস্যার সমাধান করেন।

নিচের উদাহরণগুলো খেয়াল কর –

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন পৃথিবীর উদ্ভবের কারণ। পৃথিবী কী কী পদার্থ বা উপাদান দিয়ে তৈরি তা অনুসন্ধান করেন। প্রযুক্তিবিদরা সে সব পদার্থ ব্যবহার করছেন নানা সামগ্রী উৎপাদনে।

পৃথিবী ও আকাশের অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কী বল কাজ করে? এদের গতির নিয়ম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। প্রযুক্তিবিদরা এই নিয়মের ভিত্তিতে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করেছেন আকাশে।

বিজ্ঞানীরা বস্তুর গঠন এবং বস্তুর ওপরে শক্তির নানা প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। প্রযুক্তিবিদরা বিজ্ঞানের সেই জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন নির্মাণ সামগ্রী উদ্ভাবন করেছেন।

কৃত্রিম উপগ্রহ

উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য, গঠন, বৃদ্ধি ও বিকাশের নিয়ম উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। আলো, বাতাস, পানি ও নানা উপাদান কীভাবে উদ্ভিদের ওপরে কাজ করে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেন। প্রযুক্তিবিদরা এই জ্ঞান প্রয়োগ করেন ফসল উৎপাদনের উন্নতি সাধনে।

প্রযুক্তি শুধু উদ্ভাবিত হাতিয়ার নয়। হাতিয়ার ও যন্ত্র উদ্ভাবনের জ্ঞান ও তার প্রয়োগ পদ্ধতিও প্রযুক্তি। প্রযুক্তি আমাদের শেখায় কীভাবে প্রযুক্তির ব্যবহারে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। পরিবেশের উন্নতি ঘটে। প্রযুক্তি যত নতুন ও আধুনিক তত বেশি তা বিজ্ঞানের ওপরে নির্ভরশীল। এর দৃষ্টান্ত কম্পিউটার, এক্স–রে যন্ত্র, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি।

এক্স–রে

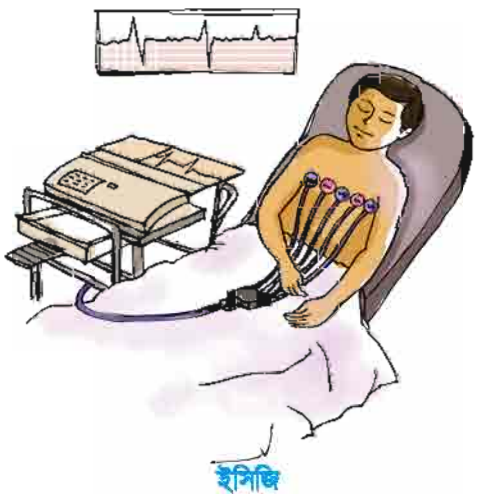
ইসিজি

প্রযুক্তি শুধু বিজ্ঞানের ওপরে নির্ভরশীল নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রযুক্তির ওপরে নির্ভরশীল। প্রযুক্তির মাধ্যমে অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীণ, এক্সরে মেশিন উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব যন্ত্র

গবেষণার কাজে ব্যবহার করার ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক গভীর হওয়াতে দ্রুত অগ্রগতি ঘটছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। আমাদের জীবন ধারার পরিবর্তন, আর্থিক স্বচ্ছলতা, দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন, অবকাশ যাপন, নিরাপত্তা সবকিছু নির্ভর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা এবং সমাজে তার প্রয়োগের ওপর।

কৃষিতে প্রযুক্তির প্রভাব

প্রযুক্তি মানব সভ্যতার মতই পুরানো। যখন থেকে সভ্যতার ইতিহাস লেখা হচ্ছে তার আগে থেকেই প্রযুক্তির ব্যবহার চলে আসছে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো খাদ্য। প্রকৃতিতে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী সহজাতভাবে জন্মে ও বৃদ্ধি পায় তা মানুষ এক সময় ব্যবহার করেছে। উদ্ভিদ, গাছের ফল, প্রাণীদের মাংস খাদ্য রূপে মানুষ এক সময় গ্রহণ করেছে শত শত বছর ধরে।

যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়ে মানুষ যখন খাদ্য উৎপাদন ও পশুপালন শুরু করল তখনই কৃষি সভ্যতার শুরু।

১৭০০ সাল পর্যন্ত কৃষি প্রযুক্তির অগ্রগতি ছিল খুব ধীর গতির। এ সময় প্রাণী ও মানুষের পেশীশক্তি ব্যবহৃত হতো জমি চাষে। ব্যবহৃত হাতিয়ার ছিল লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে ও সরল কিছু যন্ত্র।

কৃষি প্রযুক্তি

কৃষি প্রযুক্তিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এলো দুটো কারণে। একটি হলো উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন কীভাবে উদ্ভিদ সূর্যের আলো থেকে শক্তি নিয়ে এবং মাটি, পানি ও বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে খাদ্য উৎপাদন করে। অন্যটি হলো নতুন সব কৃষি যন্ত্রের উদ্ভাবন ও কৃষিকাজের যান্ত্রিকীকরণ। এর ফলে কৃষির ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে যাকে কৃষি বিপ্লব বলা যায়।

কৃষি প্রযুক্তির অগ্রগতিকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি হলো উন্নত যন্ত্র ব্যবহারের যুগ, যেমন – ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ, ফসল কাটার যন্ত্রের ব্যবহার, সেচের প্রচলন এর দৃষ্টান্ত। সেইসঙ্গে পেশীশক্তির পরিবর্তে তেল বা বিদ্যুৎ ব্যবহার ছিল এই যান্ত্রিক অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই ব্যবস্থা ছিল ব্যয়বহুল। এছাড়া ফসলের উৎপাদন এতে খুব বৃদ্ধি পায় নি।

দ্বিতীয় যুগটি হলো রাসায়নিক সার ব্যবহারের। বিভিন্ন ফসলের জন্য কী কী রাসায়নিক উপাদান প্রয়োজন তা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন। রাসায়নিক সার হিসাবে মাটিতে প্রয়োজনমত তা সরবরাহ করা হয়। এতে অনেক অনুর্বর জমিকে উর্বর করা সম্ভব হয়। এর ফলে ফসলের উৎপাদন অনেকটা বৃদ্ধি পায়।

সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কৃষিতে জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। জৈব প্রযুক্তিতে শুধু উন্নতমানের ফসল ও ফল উৎপাদন করা হয় না, উন্নত পশুসম্পদও সৃষ্টি করা হয়।

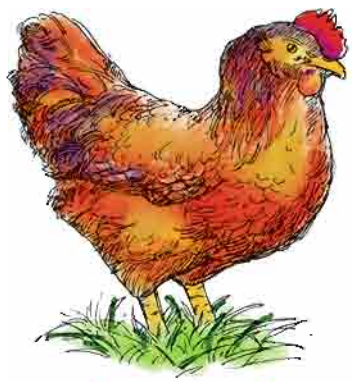

উন্নত জাতের মুরগী

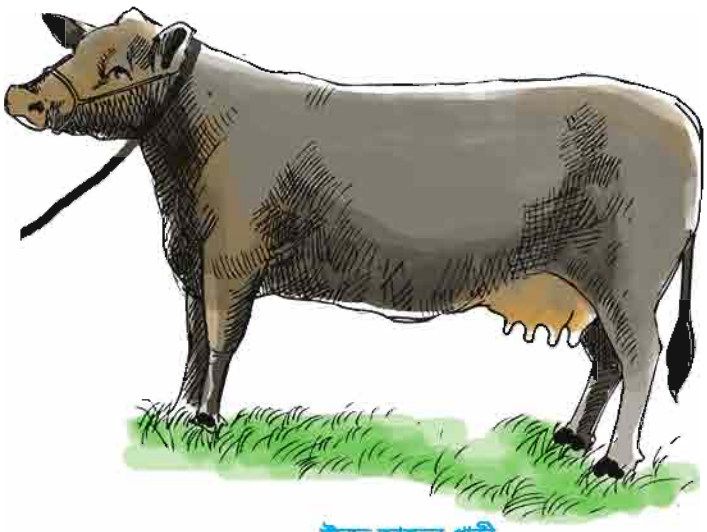

উন্নত জাতের গাভী

জৈব প্রযুক্তির একটি দিক হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

কাজ : কৃষিজাত দ্রব্যের মানোন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় এমন প্রযুক্তিগুলোর তালিকা তৈরি কর।

প্রযুক্তির অপব্যবহার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শুধু যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন মানুষেরই কীর্তি। মানুষের অনুসন্ধিৎসা পূরণ, আনন্দ সৃষ্টি ও কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যখন কোনো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, তার একটি পার্শ্বক্রিয়া থাকে।

অনেক সময় নির্বিচারে প্রযুক্তির ব্যবহার বড় ধরনের বিপদ বয়ে আনতে পারে। দ্রুত গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গাড়ি থেকে নির্গত গ্যাস ও ধোঁয়া পরিবেশকে দূষিত করতে পারে। জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করার সময় সাবধান হতে হবে। এই কীটনাশক পুকুর ও জলাশয়ে পড়ে সেখানকার মাছকে যেন ধ্বংস না করে।

রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর তৈরি করতে গিয়ে অনেক সময় বনভূমি নষ্ট করা হয়। এর ফলে গাছ যে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে নিত তা ঘটতে পারে না। বাতাসে কার্বন ডাই–অক্সাইড বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর তাপ বাইরে যেতে পারে না। পৃথিবীর তাপমাত্রা এতে বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যায়। যাতে করে অনেক নিচু জমি প্লাবিত হয়ে যেতে পারে।

আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রয়োগ হলো যুদ্ধের অস্ত্র নির্মাণ ও এর ব্যবহার।

দেখা যাচ্ছে প্রযুক্তি আমাদের হাতে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তুলে দেয়। কিন্তু আমরা সেই স্বাধীনতাকে আমাদের কল্যাণে অথবা অকল্যাণে ব্যবহার করবো তা নির্ভর করছে আমাদের ওপরে।

বিজ্ঞানের চর্চা গভীরভাবে করলে প্রতিটি প্রযুক্তির পার্শ্বক্রিয়া সম্পর্কে জানা সম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে কী ঝুকি আছে তা জানা সম্ভব। অস্পষ্ট জ্ঞান ও অদক্ষতা নিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত নয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা মানবিক হতে হবে। বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হলো প্রকৃতির ঘটনায় মিল ও সৌন্দর্যের অনুসন্ধান। বিজ্ঞানের যথার্থ চর্চা তাই নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করবে যদি মানবিকভাবে তা চর্চা করা হয়। অনেক সময় প্রযুক্তির ব্যবহার নেশায় পরিণত হয়। টেলিভিশন ও কম্পিউটারের ব্যবহার যদি সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত না হয় তা আমাদের সময়ের অপচয় ঘটায়। নিয়মিত খেলাধুলা, ব্যায়াম ও মুক্তচিন্তার পথে প্রযুক্তি সেখানে বাধা সৃষ্টি করে। খেয়াল রাখো, **এক নাগাড়ে দুই ঘণ্টার বেশী টেলিভিশন ও কম্পিউটার ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।**

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. অন্য প্রাণী থেকে মানুষ ভিন্ন কারণ মানুষ ——— ব্যবহার করে।
খ. প্রযুক্তির লক্ষ্য ——— নিয়ন্ত্রণ করা।
গ. সময় মেনে চলতে যে প্রযুক্তি অবদান রেখেছে তা হলো ———।
ঘ. নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মূল উৎস হলো———।
ঙ. প্রযুক্তির বিকাশে ——— আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।
চ. প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারে——— এর জ্ঞান প্রয়োজন।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১। নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?

ক. প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই
খ. প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান অভিন্ন
গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কযুক্ত
ঘ. প্রযুক্তির জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই

২। প্রযুক্তির উদ্ভাবনে কোনটি প্রয়োজন?

ক. আর্থিক সামর্থ্য
খ. দৈহিক সামর্থ্য
গ. বিজ্ঞানের জ্ঞান
ঘ. বংশগত পরিচয়

৩। কোনটি প্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত নয়?

ক. শিক্ষা
খ. যাতায়াত
গ. কৃষি
ঘ. দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য

৪। প্রযুক্তি সব সময়

ক. কল্যাণকর
খ. ক্ষতিকর
গ. কল্যাণকর অথবা ক্ষতিকর তা প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল
ঘ. কল্যাণকরও নয় ক্ষতিকরও নয়

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশের মিল কর।

বাম	ডান
বহুতল দালান	চিকিৎসা প্রযুক্তি
চাকা	গৃহ প্রযুক্তি
ওষুধ	তথ্যপ্রযুক্তি
কম্পিউটার	বিজ্ঞান
উদ্ভাবন	কৃষি প্রযুক্তি
আবিষ্কার	সময় মেনে চলা
ঘড়ি	প্রযুক্তি
	যোগাযোগ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন প্রযুক্তির তিনটি উদাহরণ দাও।
২. আধুনিক প্রযুক্তির তিনটি উদাহরণ দাও।
৩. তুমি ব্যবহার কর এমন সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি কী?
৪. প্রযুক্তির বিকাশ কেন ঘটে?
৫. কৃষি প্রযুক্তির তিনটি যুগ কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. তুমি যে খাবার খেয়েছ তা কোন কোন প্রযুক্তির ভিতর দিয়ে তোমার কাছে এসেছে তা বর্ণনা কর।
২. প্রযুক্তি ব্যবহার না করে আমরা বাঁচতে পারি না – ব্যাখ্যা কর।
৩. প্রযুক্তি স্থির থাকে না, ক্রমাগত বদলে যায় – এটি উদাহরণসহ ব্যাখ্য কর।
৪. প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে – ব্যাখ্যা কর।
৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ কর।
৬. প্রযুক্তির ব্যবহারে মানবিক হওয়া উচিত কেন?
৭. বিজ্ঞানের অপব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

দশম অধ্যায়

আমাদের জীবনে তথ্য

যন্ত্র প্রযুক্তি মানুষের কায়িক শ্রমের লাঘব ঘটিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উদ্ভাবিত যে নতুন প্রযুক্তি আমরা পেয়েছি তা হলো তথ্যপ্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশ সম্পর্কে তোমরা আগের শ্রেণিতে জেনেছ। যান্ত্রিক প্রযুক্তি কাঁচামাল বা যোগান হিসাবে ব্যবহার করেছে বস্তু বা শক্তিকে । তথ্য প্রযুক্তিতে তথ্য হলো কাঁচামাল বা সম্পদ। তথ্যকে প্রক্রিয়াকরণ করে উন্নততর তথ্য প্রাপ্তি হলো উৎপাদন বা Output।

লিপি আবিষ্কার মানুষকে সেই মুখস্ত করার শ্রম থেকে অনেকটা মুক্তি দিয়েছে। লিপি আবিষ্কারের ফলে মানুষ তাঁর মস্তিষ্ককে তথ্য ধারণের কাজে কম ব্যবহার করে নতুন কোন সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করল।

ছাপাখানার উদ্ভাবন তথ্যপ্রযুক্তির আর একটি অগ্রগতি সাধন করে। মানুষ ব্যাপকভাবে তথ্য ধারণ ও সঞ্চারণ করতে সক্ষম হলো। জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তার বৃদ্ধি পেল দ্রুত।

কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ

ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লব এনেছে। গত কয়েক দশকে এর অগ্রগতি বিষ্ময়কর প্রভাব ফেলেছে মানুষের বুদ্ধিগত কাজে। এর প্রধান কারণ হলো তথ্য এখন প্রাকৃতিক সম্পদের মতই মূল্যবান। বস্তুগত সম্পদ যেমন মানুষের জীবনযাত্রার মান বদলাতে পারে, সমস্যার সমাধান দিতে পারে, তথ্যও তেমনি গভীরভাবে আমাদের জীবনধারাকে বদলে দিতে পারে এবং সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

যে কোনো পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর যখন সংগৃহীত হয় তাকে উপাত্ত বা Data বলা হয়। এই উপাত্ত হলো কাঁচামালের মত। উপাত্ত যখন বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে আমরা তথ্য বলি। সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন ধাপে ধাপে প্রক্রিয়াজাত করে উন্নত সম্পদ সৃষ্টি করা হয়, তথ্যও তেমনি প্রক্রিয়াজাত করে অর্থাৎ রূপান্তরিত করে উন্নত সম্পদ সৃষ্টি করা হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি বলতে বোঝায় তথ্য সংগ্রহ করা, তথ্যের প্রক্রিয়া করা। এ ছাড়া তথ্যকে ধারণ করা, সংরক্ষণ করা, তথ্য পুনরুদ্ধার করা, প্রেরণ করা, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করাও তথ্যপ্রযুক্তির কাজ।

আমাদের ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। মনে কর, সমুদ্র উপকূলে বায়ুচাপ ভীষণ হ্রাস পেল। এই উপাত্তকে বিশ্লেষণ করে আবহাওয়া বিজ্ঞানী জানলেন যে প্রচণ্ড জলচ্ছ্বাস হবে। এ তথ্য রেডিওতে প্রচারিত হলে সমুদ্র উপকূলের অনেকের জীবন রক্ষা পাবে। এতে ব্যক্তিগত জীবন রক্ষা যেমন পেল, তেমনি এলাকাবাসী তাদের সম্পদ রক্ষার কাজে ও জীবন রক্ষার কাজে এই তথ্য ব্যবহার করে উপকৃত হলো। সমুদ্রের জাহাজগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করতে পারল।

আবার মনে কর, মাটির নিচে মজুদ খনিজ সম্পদের তথ্য পাওয়া গেল। এই তথ্য পেতে অবশ্য আধুনিক প্রযুক্তি লাগবে। যেমন শব্দ তরঙ্গ পাঠিয়ে বা চুম্বকক্ষেত্র মেপে তথ্য পাওয়া গেল। সেই তথ্য কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে বা অনেক গাণিতিক হিসাব কষে জানা গেল তেল, কয়লা বা খনিজ সম্পদের উপস্থিতি। আমাদের ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন এর দ্বারা প্রভাবিত হবে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব তুমি সহজেই অনুধাবন করতে পার। কঠিন কোনো অসুখ যেমন – হৃদরোগ বা ক্যান্সারে কেউ আক্রান্ত হলে তা নির্ণয়ে তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। যদি হার্টের বা টিউমারের অস্ত্রোপাচার প্রয়োজন হয় সেখানেও তথ্যপ্রযুক্তি অত্যাবশ্যক। তথ্য বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ, বিভিন্ন ওষুধের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, নানা রকম ব্যাধির চিকিৎসায় অর্জিত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই ইন্টারনেটে পাওয়া সম্ভব।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে যেকোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ যেমন সহজ, তথ্য পৌঁছে দেওয়াও তেমনি সহজ। খেলাধুলা, সাহিত্য, শিল্পকলা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নতুন অবিষ্কার ও উদ্ভাবন সবকিছু সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে।

আসলে তথ্যপ্রযুক্তি একটি নতুন সম্ভাবনা তুলে ধরেছে জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান সৃষ্টিতে। বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একে বলা হচ্ছে– তথ্যবিপ্লব।

তোমরা খেয়াল করেছ, কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য ধারণ ও সংরক্ষণ, তথ্য পুনরুদ্ধার ও প্রেরণ কত সহজ ও দ্রুত হয়েছে।

ডেস্কটপ কম্পিউটার

ল্যাপটপ কম্পিউটার

একই পরিমাণ তথ্য আদান প্রদান ও প্রক্রিয়াজাত করতে প্রথম দিকের কম্পিউটার যেখানে একটি পুরো দালান দখল করত, আধুনিক ল্যাপটপ কম্পিউটার সেখানে একটি বইয়ের সমান জায়গা নেয়। বিদ্যুৎ খরচও অনেক কমে গেছে আগের তুলনায়। বলা হয়ে থাকে আধুনিক একটি ক্ষুদ্র কম্পিউটারের পরিবর্তে যদি প্রথম দিকের পুরানো ভাল্ব কম্পিউটার ব্যবহার করা হত, তাহলে পুরো একটি নদীর পানি লাগতো তা ঠান্ডা করতে।

এখন যে দ্রুত জ্ঞানের বিস্তরণ ঘটছে তাতে প্রতি দশ বছরে বিশ্বের জ্ঞান দ্বিগুণ হচ্ছে। একদিকে তথ্যপ্রযুক্তি এর কারণ, অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তি এর ফল।

আধুনিক যুগের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো সমগ্র বিশ্ব এখন তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে সংযুক্ত। আমাদের স্নায়ুতন্ত্র যেমন দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে অনেকটা তেমন। তুমি যদি এই তথ্যজগতের অংশ হয়ে উঠতে চাও তাহলে সহজেই তা করতে পার ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহার করে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথম কাজ হলো প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান। এজন্য Browsing Software যেমন ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্যবহার করতে পার। নির্দিষ্ট তথ্যের উৎস খোঁজার জন্য অনেক search ইঞ্জিন আছে যেমন গুগল (google)। এর জন্য তোমার কম্পিউটারের ইন্টারনেটে যাও এবং address box এ www.google.com লিখ। এতে যে নতুন উইন্ডো আসবে তাতে এ তথ্য সম্পর্কে লিখলেই search ইঞ্জিন এ সম্পর্কে ইন্টারনেটে যে সব ওয়েব পেজ আছে, তা দেখাবে। এছাড়া image, videos, shopping বা অন্য option select করে তথ্য সম্পর্কিত ছবি, ভিডিও বা product কেনা সম্পর্কে তথ্য নেওয়া যাবে।

মোবাইলে ইন্টারনেট

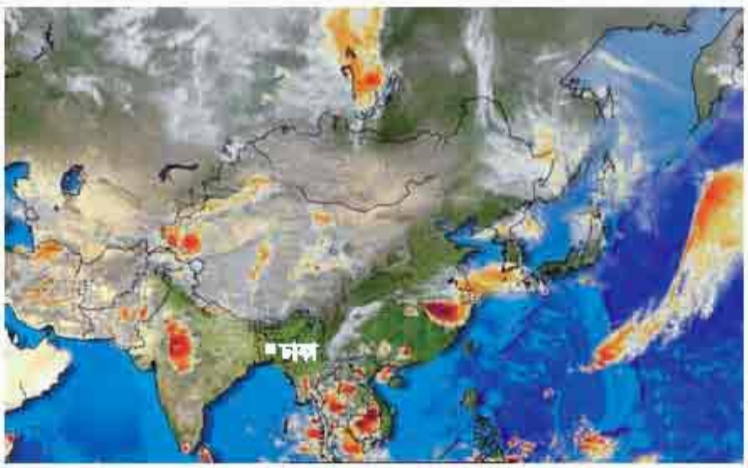
ইন্টারনেটে পাওয়া আবহাওয়ার ছবি

উইকিপিডিয়া

সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণ

সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণের জন্য উপরের Manu Bar এর বাম দিকে file select কর। "Save As" নির্বাচন করে File, Name এর জায়গায় ফাইলের নাম ও "Save in" এ সংরক্ষণের স্থান নির্দিষ্ট করে সংরক্ষণ কর। এছাড়া মাউস (mouse) দিয়ে দরকারি অংশ নির্বাচন করে তা কপি করার পর কম্পিউটারের মেমরি বা উপযুক্ত স্থানে Paste করা যায়।

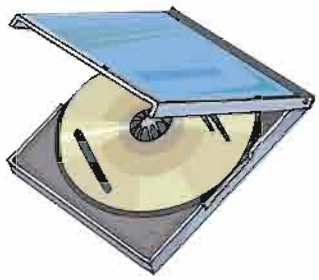

ডিভিডি

মেমরি কার্ড

পেন ড্রাইভ

তথ্য বিনিময়

তথ্য বিনিময় করার জন্য তথ্য প্রিন্ট করে বা কপি করে অন্যের portable memory তে তথ্য আদান প্রদান করতে পার । ইন্টারনেট ব্যবহার করেও তুমি তথ্যের আদান প্রদান করতে পার।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

ক. মানুষের কায়িক শ্রম লাঘব করেছে———।
খ. বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমরা পেয়েছি———।
গ. তথ্যপ্রযুক্তিতে তথ্য হলো ————।
ঘ. তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে————।
ঙ. বিশ্বের জ্ঞানভান্ডার দ্রুত——— পাচ্ছে।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. অনেক তথ্য অল্প জায়গাতে অথচ সহজে বহন যোগ্য কোন যন্ত্রে ধারন করা উচিত
ক. ডিভিডি খ. পেনড্রাইভ
গ. সিডি ঘ. ল্যাপটপ

২. তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের লাঘব করেছে–
ক. বুদ্ধিগত কাজ খ. কায়িক শ্রম
গ. যাতায়াত ঘ. কৃষি শ্রম

৩. সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি হলো

ক. কৃষি প্রযুক্তি　　খ. যাতায়াত প্রযুক্তি

গ. তথ্যপ্রযুক্তি　　ঘ. গৃহ নির্মাণ প্রযুক্তি

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশের মিল কর

বাম	ডান
প্রক্রিয়াকরণ	মনিটর
আউটপুট	সিপিইউ
ইনপুট	পেন ড্রাইভ
সংরক্ষণ	কী বোর্ড
	মাউস

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি কী ?

২. কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইসগুলোর নাম কী ?

৩. কম্পিউটারের আউটপুট ডিভাইসগুলোর নাম লিখ।

৪. ইন্টারনেট কী কী কাজে লাগে ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. তথ্যপ্রযুক্তি বলতে কী বুঝ?

২. আমাদের জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব কী?

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি কীভাবে কাজে লাগে?

৪. তথ্য সংরক্ষণের উপায়গুলো লিখ।

৫. ইন্টারনেটের মাধ্যমে কীভাবে আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করবে?

একাদশ অধ্যায়

আবহাওয়া ও জলবায়ু

আবহাওয়া কী?

তোমরা দেখ, কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি। কখনও বা গরম, কখনও শীত। আবার কখনও মেঘ, কখনও বা কুয়াশা। বায়ু কখনও বা খুব জোরে প্রবাহিত হয়। বায়ু আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে প্রবাহিত হয়। বায়ুকে কখনো আমাদের কাছে শুষ্ক মনে হয়, কখনও ভেজা মনে হয়।

কোনো জায়গার রোদ, বৃষ্টি, তাপমাত্রা, মেঘ, কুয়াশা ও বায়ুপ্রবাহ এ অবস্থাগুলো মিলে হয় আবহাওয়া। এই অবস্থাগুলো অল্প সময়ের মধ্যে পাল্টে যেতে পারে। আবার একই সময়ে দুটি কাছাকাছি জায়গার আবহাওয়া ভিন্ন হতে পারে।

আবহাওয়া বার্তা

জলবায়ু কী?

আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকলেও এরা এক নয়। আবহাওয়া হলো কোন জায়গার অল্প সময়ের অবস্থা। জলবায়ু হলো কোন জায়গার অনেক বছরের আবহাওয়ার একটি সামগ্রিক অবস্থা। যেমন আমরা দেখি বাংলাদেশে তিনমাসের মতো সময়ব্যাপী শীত পড়ে। বছরের বাকি সময়টা গরম পড়ে। তিনমাস বেশ বৃষ্টি হয়। বায়ু ভেজা বা আর্দ্র থাকে। এরকম আবহাওয়া তোমার বাবা–মা যখন ছোট ছিলেন তখনও দেখা যেত। বিশ বা ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশের সামগ্রিক আবহাওয়া অর্থাৎ জলবায়ু মোটামুটি একই রকম দেখা যায়। বাংলাদেশের জলবায়ু তাই উষ্ণ এবং আর্দ্র।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য

তোমরা দেখলে আবহাওয়া কোনো জায়গার স্বল্প সময়ের অবস্থাকে প্রকাশ করে। আর জলবায়ু হচ্ছে কোন জায়গার দীর্ঘ সময়ের আবহাওয়ার সামগ্রিক ফল। বাংলাদেশে মোটের উপর গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া বেশি সময় ধরে দেখা যায়। তাই বাংলাদেশের জলবায়ুকে গরম ও আর্দ্র বলা হয়। সামগ্রিকভাবে যেখানে বছরের বেশির ভাগ সময়ে শীত পড়ে সেখানকার জলবায়ুকে শীতল জলবায়ু

বলা হয়। তাহলে কি বুঝতে পারলে, আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?
আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে আসল পার্থক্য হলো সময়ের। কোনো জায়গার রোদ, বৃষ্টি, তাপমাত্রা, মেঘ, কুয়াশা ও বায়ুপ্রবাহ এগুলোর অল্পকালীন অবস্থা হলো আবহাওয়া। আর জায়গাটির ঐ অবস্থাগুলোর দীর্ঘ সময়ের সামগ্রিক ফল বা আবহাওয়া হলো জলবায়ু।

আবহাওয়ার নিয়ামকসমূহ

অনুসন্ধান: একটি দৈনিক পত্রিকা নাও। খুঁজে বের কর কোথায় আবহাওয়ার খবর আছে। ভালোভাবে আবহাওয়ার খবরটি পড়। দেখ বৃষ্টি, দমকা হাওয়া বা ঝড় হতে পারে এমন কোন কথা বলা আছে কিনা? কীভাবে এমন পূর্বাভাস দেওয়া হয়? তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা কর।

তোমরা কি কখনও ধারণা করতে পার কখন বৃষ্টি হবে বা ঝড় হবে? তোমরা হয়তো লক্ষ করে থাকবে যে, কোনোদিন খুব ভ্যাপসা গরম লাগলে বা প্রচুর ঘাম হলে সেদিন বৃষ্টি হয়। ভ্যাপসা গরমে কেন ঘাম হয়? তোমরা জলীয়বাষ্পের কথা জেনেছো। জলীয়বাষ্প বেশি থাকলে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে। যদি ভ্যাপসা গরম লাগে তাহলে দেখা যায় ঐদিন বৃষ্টি হয়।

জলীয়বাষ্পের কারণে আবহাওয়া পাল্টায় তাই এটি আবহাওয়ার একটি নিয়ামক। বায়ুতে জলীয়বাষ্প কী পরিমাণে আছে তা মাপা যায়। একে বায়ুর আর্দ্রতা হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

আবহাওয়ার আরেকটি নিয়ামক হলো সূর্যের তাপ। তোমরা দেখেছ, সকালে গরম কম লাগে কিন্তু দুপুরবেলা বেশ গরম পড়ে। কেন? সকালে সূর্যের কিরণ তির্যকভাবে কোন স্থানে এসে পড়ে। তির্যকভাবে আসতে সূর্যকিরণকে বায়ুমণ্ডলের অনেক স্তরের ভেতর দিয়ে আসতে হয়। এতে সূর্যের তাপ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু দুপুরে সূর্য আমাদের মাথার উপর থেকে খাড়াভাবে কিরণ দেয়। সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দিলে বায়ুমণ্ডলের কম স্তরের ভেতর দিয়ে আসে এবং কম জায়গায় ঘন হয়ে পড়ে। এতে সূর্যের তাপ বেশি পড়ে। তাই দুপুরবেলা বেশ গরম পড়ে।

কতটা গরম লাগছে বা ঠান্ডা লাগছে তা প্রকাশ করা হয় তাপমাত্রা দিয়ে। তাপমাত্রা যত বেশি তত গরম আর যত কম তত ঠান্ডা। আমাদের দেশে শীতকালে তাপমাত্রা কম আর গরমকালে তাপমাত্রা বেশি।

আবহাওয়ার আরেকটি নিয়ামক হলো বায়ুচাপ। কোন জায়গায় বায়ু বেশি ঘন হলে বায়ুচাপ বেশি হয়। বায়ু হালকা হলে বায়ুচাপ কম। বায়ুচাপ কমবেশি হলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। বায়ু বেশি চাপের জায়গা থেকে কম চাপের জায়গায় প্রবাহিত হয়। আবার বায়ুচাপ কম বেশি হওয়ার কারণ তাপ। কোন জায়গার

বায়ুপ্রবাহ

তাপমাত্রা বেশি হলে সেখানকার বায়ু হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে বায়ুচাপ কমে যায়। এরকম অবস্থাকে বলে নিম্নচাপ। তখন আশেপাশে যেখানে বায়ুচাপ বেশি সেখান থেকে বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। এভাবে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। যে স্থানে তাপমাত্রা কম সেখানে বায়ু ঘন থাকে। ফলে বায়ুচাপ বেশি থাকে।

আমাদের দেশে আমরা দেখি শীতকালে বায়ু উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এর বিপরীত। কেন বায়ুপ্রবাহ একেক সময় একেক দিকে? মানচিত্র দুটি খেয়াল কর। শীতকালে সূর্য বাংলাদেশের দক্ষিণে খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই সেখানে বায়ুচাপ কম থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশের উত্তরে বেশ শীত এবং বায়ুচাপ বেশি। তাই শীতকালে বাংলাদেশের উত্তর দিক থেকে বায়ু দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু স্থলভাগ থেকে আসে বলে এতে জলীয়বাষ্প কম থাকে। এজন্য শীতকালে বায়ু শুষ্ক এবং তাই বৃষ্টি কম হয়।

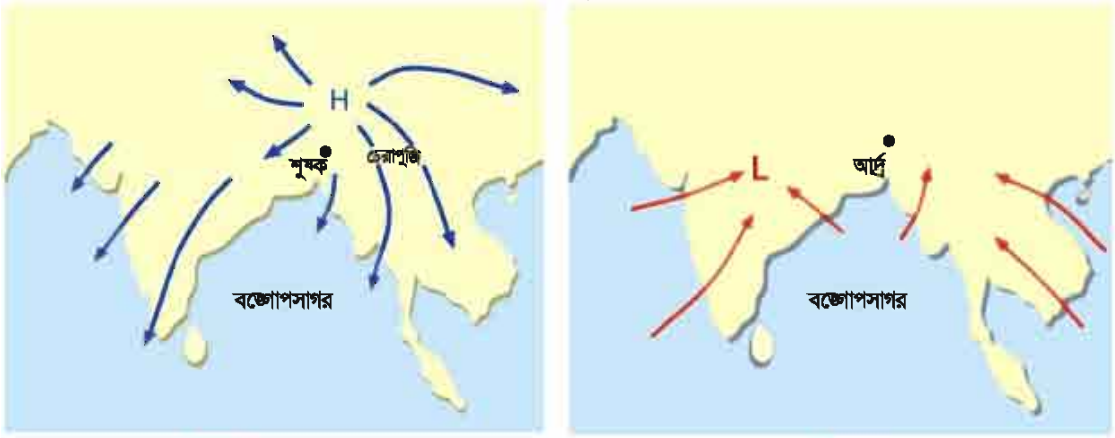

বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগরের মানচিত্র ও বায়ুপ্রবাহ

আবার গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশের উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই বাংলাদেশে তখন বেশ গরম এবং বায়ুচাপ কম থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তখন কম গরম, তাই বায়ুচাপ বেশি। তাই তখন বায়ু বঙ্গোপসাগর এলাকা থেকে বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ দিক থেকে এই বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প নিয়ে আসে। এই জলীয়বাষ্প ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টি হয়। এজন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বায়ু আর্দ্র থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টি হয়।

বিরূপ আবহাওয়া:

তোমরা আবহাওয়ার খবরে মাঝে মধ্যেই নিম্নচাপের কথা শুনে থাকবে। বায়ুমন্ডলে সমসময়ই কোন একটি এলাকাতে বায়ুচাপ কমে যায় এবং পাশের এলাকায় বায়ুচাপ বেশি থাকে। এর ফলেই স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহ দেখি। তবে কখনও কখনও কোন এলাকায় বায়ুর চাপ ভীষণভাবে কমে যেতে পারে। তখন উচ্চচাপের এলাকা থেকে বায়ু নিম্নচাপের এলাকার দিকে ধাবিত হয়। নিম্নচাপ এলাকায় চাপ খুব কমে গেলে আমরা অস্বাভাবিক বা বিরূপ আবহাওয়া দেখি। বিরূপ

আবহাওয়া মারাত্মক আকার ধারণ করলে তা প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিণত হয়। আমাদের দেশে আবহাওয়াজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বেশি দেখা যায় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ও বজ্রবৃষ্টি, টর্নেডো ইত্যাদি। এ শ্রেণিতে তোমরা কালবৈশাখী ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে জানবে।

বজ্রপাত

মেঘ

কালবৈশাখী: আমাদের দেশে আমরা কোন সময়ে কালবৈশাখী দেখতে পাই? সাধারণত চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসে বিকেলের দিকে, তাই না? কালবৈশাখী কোন দিক থেকে ধেয়ে আসে? উত্তর পশ্চিম দিক থেকে তাই না? বৈশাখ মাসে সাধারণত সূর্য বাংলাদেশ ও তার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয়। ফলে এ অঞ্চলের বায়ু সকাল থেকে দুপুরের রোদের তাপে হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। এভাবে বিকেলের দিকে এ অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সময় দেশের উত্তরে ও হিমালয়ের দিকে বায়ুর চাপ থাকে বেশি। তাই উচ্চচাপের উত্তরাঞ্চল থেকে বায়ু প্রবল বেগে দক্ষিণ দিকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। এটিই কালবৈশাখী।

ঘূর্ণিঝড়: ঘূর্ণিঝড় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড়কে বলা হয় সাইক্লোন। জাপান ও পূর্ব এশিয়ায় একে টাইফুন বলা হয়। ঘূর্ণিঝড়ও অতিরিক্ত নিম্নচাপের কারণে সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি

ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন

সাধারণত মহাসাগরে। বাংলাদেশে যেসব ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে সেগুলো ভারত মহাসাগর বা বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ থেকে সৃষ্টি হয়। রোদের তাপে বঙ্গোপসাগর বা ভারত মহাসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। নিম্নচাপ অঞ্চলের বায়ুর স্বল্পতা পূরণের জন্য চারদিকের উচ্চচাপ এলাকা থেকে বায়ু একসাথে ছুটে আসে। ফলে নিম্নচাপ এলাকায় চিত্রের মতো বাতাসের ঘূর্ণন শুরু হয়। এ রকম ঘূর্ণায়মান বায়ু প্রচুর জলীয়বাষ্পসহ স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হয়। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূল অথবা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা উপকূলে আঘাত হানে। স্থলভাগে প্রবেশ করার পর ঘূর্ণিঝড় বাড়ি ঘর, গাছপালা ইত্যাদিতে বাধা পেয়ে দূর্বল হয়ে যেতে থাকে। তবে দুর্বল হবার আগে পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বাড়িঘর, মাছের খামার, ক্ষেতের ফসল ও গাছপালা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা

মানুষ ও গবাদিপশু মারা পড়ে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের সাথে আসা জলীয়বাষ্পের কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সমুদ্র থেকে ঢেউ আকারে লবনাক্ত পানি উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে। একে জলোচ্ছ্বাস বলে। অনেক সময় জলোচ্ছ্বাস উপকূলীয় অঞ্চলের সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. জলবায়ু হলো কোন স্থানের দীর্ঘ সময়ের ———— ফল।
খ. কোনো জায়গার রোদ, বৃষ্টি, তাপমাত্রা, মেঘ, কুয়াশা ও বায়ুপ্রবাহ এগুলোর অল্পসময়ের অবস্থা হলো ————।
গ. বায়ুতে ———— বেশি থাকলে আমাদের ঘাম হয়।
ঘ. সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দিলে তাপ ———— পাওয়া যায়।
ঙ. কোনো স্থানে তাপমাত্রা কম থাকলে সেখানে বায়ু ———— থাকে।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. বায়ুর তাপমাত্রা দিয়ে কী প্রকাশ করা হয়?
ক. কতটা গরম বা ঠান্ডা
খ. জলীয়বাষ্প কম না বেশি
গ. বায়ু ঘন না হালকা
ঘ. রোদ কম না বেশি

২. বর্ষাকালে কেন বেশি বৃষ্টি হয়?
ক. বায়ুর তাপমাত্রা বেশি বলে
খ. বায়ুচাপ বেশি বলে
গ. বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি বলে
ঘ. বায়ু শুষ্ক বলে

৩. বায়ুচাপ খুব কমে গেলে কী দেখা যায়?
ক. ঝড়
খ. বৃষ্টি
গ. তাপ প্রবাহ
ঘ. শৈত প্রবাহ

৪. বাংলাদেশে কোনটি প্রতিবছর দেখা যায়?
ক. বন্যা
খ. ভূমিকম্প
গ. কালবৈশাখী
ঘ. হারিকেন

৫. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মূল পার্থক্য কিসে?
ক. সময়ে
খ. স্থানে
গ. নামে
ঘ. বৈশিষ্ট্যে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আবহাওয়া পরিবর্তনের নিয়ামকগুলো কী কী?
২. বাংলাদেশের তিনটি প্রাকৃতিক দূর্যোগের নাম লিখ।
৩. নিম্নচাপ কীভাবে সৃষ্টি হয়?
৪. বায়ুর আর্দ্রতা দিয়ে কী বোঝানো হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কোনোদিন ভ্যাপসা গরম পড়লে বা গরমে ঘাম হলে দেখা যায় সেদিন বৃষ্টি হয়। কেন হয় তা ব্যাখ্যা কর।
২. সূর্যতাপ কীভাবে আবহাওয়া পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা কর।
৩. বাংলাদেশে শীতকালে বৃষ্টি কম হয় কেন?
৪. বর্ষাকালে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয় কেন?
৫. কালবৈশাখী ঝড় কেন হয় তা ব্যাখ্যা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

জলবায়ুর পরিবর্তন

জলবায়ুর পরিবর্তন কী?

তোমরা জেনেছো যে, জলবায়ু হলো কোন স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার গড় বা সামগ্রিক অবস্থা। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। তোমরা দেখ যে, বাংলাদেশে সাধারণত পৌষ ও মাঘ এই দুমাস শীত পড়ে। তারপর শীত কমে গিয়ে ধীরে ধীরে আবহাওয়া উষ্ণ হতে থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এ দুমাস বেশ গরম পড়ে। এই দুমাসকে আমরা বলি গ্রীষ্মকাল। বৈশাখ মাসে প্রতি বছরই কালবৈশাখী দেখা যায়। আষাঢ়ের শুরু থেকে বর্ষাকাল শুরু হয়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বেশ গরম ও বৃষ্টি পড়ে। তারপর আবার আবহাওয়া ঠান্ডা হতে থাকে এবং পৌষ মাসে শীত ফিরে আসে। এটাই হলো বাংলাদেশের জলবায়ুর স্বাভাবিক রূপ। বছরের পর বছর মোটামুটি এরকমই আমরা দেখে থাকি।

কোনো স্থানের জলবায়ু হঠাৎ পরিবর্তন হয় না। তবে বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখতে পেয়েছেন যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। অর্থাৎ পৃথিবী ধীরে ধীরে গরম বা উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলে। আর বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে।

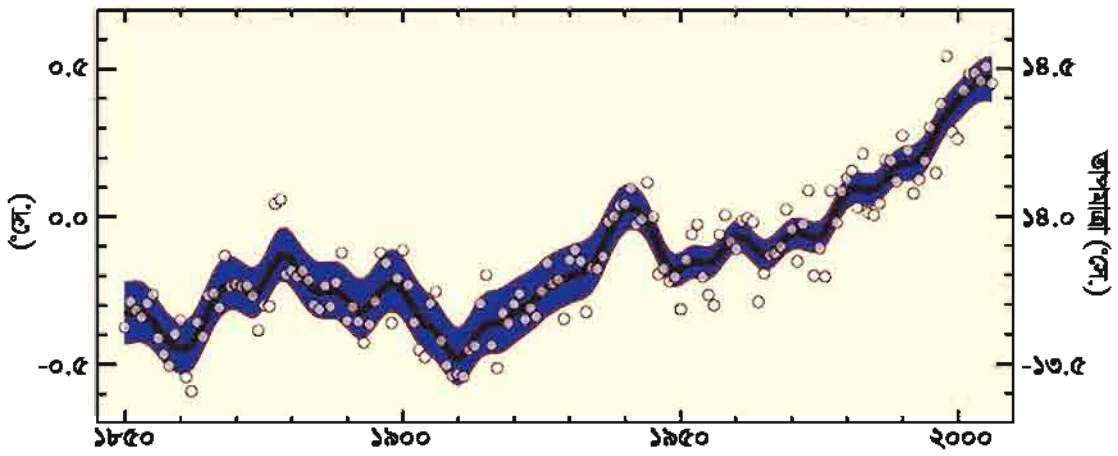

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির চিত্র

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ কী?

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কলকারখানা ও যানবাহনে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো হচ্ছে। এসব জ্বালানি পোড়ানোর ফলে পরিবেশে কার্বন ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। একই সাথে, বন উজাড় করে ফেলার কারণে গাছ কার্বন ডাই–অক্সাইড শোষণ করছে কম। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই–অক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কার্বন ডাই–অক্সাইড বেড়ে গেলে কেন তাপমাত্রা বাড়ছে?

অনুসন্ধান: গ্রিন হাউজ প্রভাব

কাজটি করতে যা যা দরকার: দুটি সমান মাপের পানির গ্লাস, পানি, ১০ টুকরা সমান আকারের বরফ, একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ।

পদ্ধতি

১. গ্লাসের তিনভাগের একভাগ করে দুটি গ্লাসে সমান পরিমাণ পানি নাও।
২. প্রতিটি গ্লাসে পাঁচ টুকরো করে বরফ নাও।
৩. একটি গ্লাস প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতর রেখে ব্যাগের মুখটি আটকে দাও।
৪. দুটি গ্লাস এবার রোদে রেখে দাও। অনুমান কর তো, কোনটির বরফ আগে গলবে? তোমাদের উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
৫. মাঝে মাঝে খেয়াল কর বরফ কতটুকু গলে গেল। কোন গ্লাসটির বরফ আগে গলছে? তোমাদের অনুমানের সাথে মিলেছে কি?

অনুসন্ধানের ফল ও তার ব্যাখ্যা :

দেখা গেল যে গ্লাসটি প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর ছিল তার বরফ আগে গলেছে। কেন তা বলতে পারো? সূর্যের তাপ দুটি গ্লাসের বরফের উপর সমানভাবে পড়ছে। যে গ্লাসটি প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতরে আছে সেটিতে তাপ প্রবেশ করতে পারে কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যাগ ভেদ করে তাপ বের হতে পারে না। ফলে প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতরে রক্ষিত গ্লাসটি তাড়াতাড়ি গরম হয় এবং বরফ তাড়াতাড়ি গলে।

শীতপ্রধান দেশে তীব্র শীতে গাছপালা টিকে থাকতে পারে না। সেখানে এভাবে কাঁচের বা প্লাস্টিকের ঘর বানিয়ে সবুজ শাকসবজি চাষ করা হয়। তাই এরকম ঘরকে গ্রিন হাউজ বা সবুজ ঘর বলে। কাঁচের ঘরের ভিতরে এভাবে তাপ থেকে যাওয়ার বিষয়টিকে গ্রিন হাউজ প্রভাব বলে।

পৃথিবীটাকে একটি গ্রিন হাউজের মতো ধরা যায়। পৃথিবীর চারদিক ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। এ বায়ুমণ্ডলে আছে কার্বন ডাই–অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্পসহ অন্যান্য গ্যাস। কার্বন ডাই–অক্সাইড, মিথেন ও জলীয় বাষ্প গ্রিন হাউজের কাচের বা প্লাস্টিকের মতো কাজ করে। এরা সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসতে কোন বাধা দেয় না। ফলে সূর্যের তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। কিন্তু এ গ্যাসগুলো উত্তপ্ত পৃথিবী থেকে তাপকে চলে যেতে বাধা দেয়। ফলে পৃথিবী রাতের বেলায়ও গরম থাকতে পারে। এসব গ্যাসকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলে। কার্বন ডাই–অক্সাইড, মিথেন আর জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে থাকা মানব সভ্যতার জন্য আশীর্বাদ। কারণ এসব গ্যাস না থাকলে পৃথিবী থেকে তাপ মহাশূন্যে চলে যেত। আর পৃথিবী রাতের বেলায় ভীষণ ঠান্ডা হয়ে পড়ত।

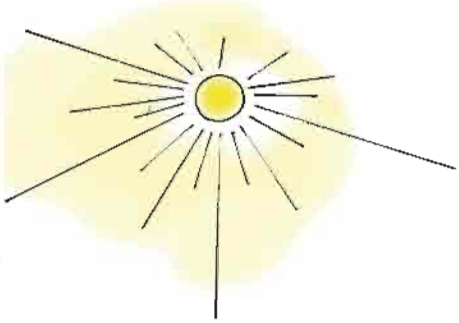

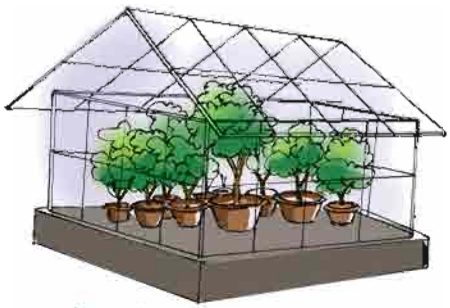

গ্রিন হাউজ

এখন প্রশ্ন হলো, আশীর্বাদ আবার কীভাবে সমস্যা হলো? সমস্যা হলো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি থাকায় এরা বেশি বেশি তাপ ধরে রাখতে পারছে। তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মুল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। আর কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ার কারণ জ্বালানি পোড়ানো ও বন উজাড় করা।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের ও পর্বতের চূড়ার বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এভাবে তাপমাত্রা ও সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়তে থাকলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রের জলে ডুবে যেতে পারে। সাগর থেকে নদীতে নোনা জল ঢুকে পড়তে পারে। এছাড়া, প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঘন ঘন ঘটতে পারে।

নিচের চিত্র দুটি দেখ। উত্তর মেরুতে বরফ যে কমে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে।

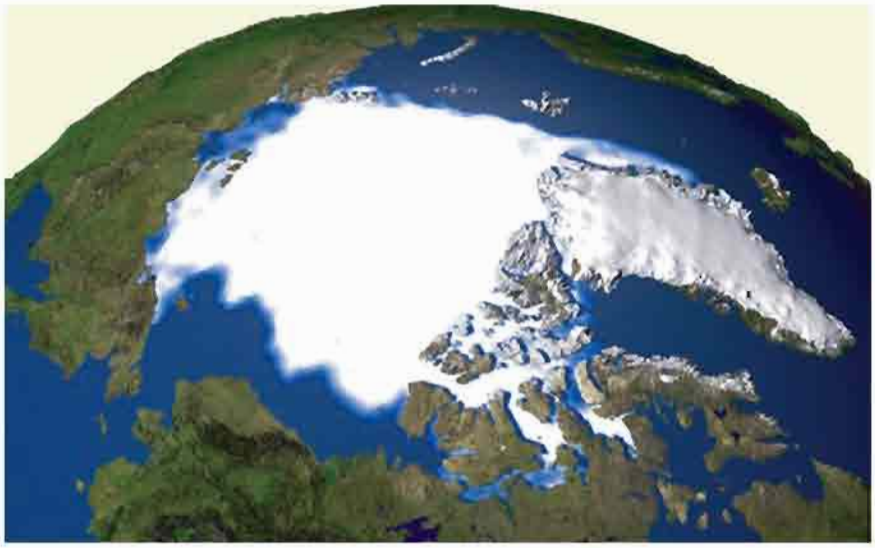

১৯৭৯ সালে উত্তর মেরুতে বরফের পরিমাণ

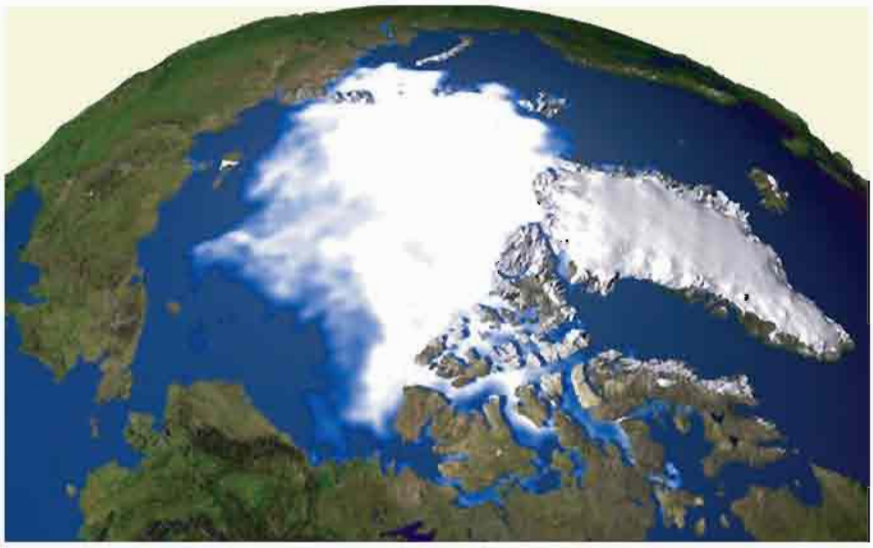

২০০৩ সালে বরফের পরিমাণ।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে কী করণীয়?

আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ জানলাম। উপরের আলোচনা থেকে আমরা প্রবাহ চিত্রটি আঁকতে পারি।

উপরের প্রবাহ চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। আর বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমান বৃদ্ধি। তাহলে কীভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করা যায়? সহজ উত্তর হলো, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নিঃসরণ কমানো বা কোনোভাবে এদেরকে বায়ুমণ্ডল থেকে সরিয়ে নেওয়া।

কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো কমিয়ে তার বদলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি (যেমন, সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ, জৈব জ্বালানি) ব্যবহার করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ কমে। বিদ্যুৎ, গ্যাস এগুলো কম ব্যবহার করলেও কার্বন ডাই-অক্সাইড কম উৎপন্ন হয়। বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড কমানোর জন্য আরেকটি উপায় রয়েছে। তা হলো বেশি করে গাছ লাগানো। কারণ গাছ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করে। ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড কমে আসে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলা বা অভিযোজন

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারপরও জলবায়ু পরিবর্তন পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করতে হবে আমাদের। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপায়ে টিকে থাকা যায়। এখানে তিনটি পদক্ষেপের কথা আলোচনা করা হলো।

১। প্রতিকূল অবস্থা শুরু হওয়ার আগেই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ। যেমন, বন্যার আগেই শুকনা খাদ্য সংগ্রহ, ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া। ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া।

২। বাংলাদেশের কিছু এলাকা বর্ষাকালে ডুবে থাকে। এরকম জায়গায়

আশ্রয়কেন্দ্র

কৃষকেরা ধান গাছের মুড়া বা গোড়া, কচুরিপানা এসব দিয়ে ভাসমান ধাপ তৈরি করেন। ধাপের উপর কৃষকরা কখনও অল্প পরিমাণে মাটি দিয়ে দেন। এই ধরনের ভাসমান ধাপগুলোর উপর লাউ, সীম, বেগুন, ঢেঁড়স, টমেটো, ঝিঙ্গা এরকম সবজি চাষ করা হয়। আবার পানি শুকিয়ে গেলে এ ধাপ কম্পোস্ট সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা হয়। এভাবে বন্যার সময়ে ফসল চাষ করা যেতে পারে।

৩। উপকূলীয় অঞ্চলে নোনাপানি প্রবেশের কারণে জমি লবণাক্ত হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে লবণাক্ত মাটিতে জন্মাতে পারে এরকম ফসলের জাত উদ্ভাবন করে চাষ করা যেতে পারে।

অনুশীলনী

শুন্যস্থান পুরণ কর

১. পৃথিবীর ——— বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলে।
২. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে ——— গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি।
৩. কার্বন ডাই–অক্সাইডের বৃদ্ধির কারণ ———।
৪. শীতপ্রধান দেশে শাক সবজি চাষ করার জন্য যে কাঁচের ঘর ব্যবহার করা হয় তাকে ——— বলে।
৫. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চল ——— যেতে পারে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গ্রিন হাউজ গ্যাসগুলো কী কী?
২. শীতপ্রধান দেশে কী উদ্দেশ্যে গ্রিন হাউজ বানানো হয়?
৩. গ্রিন হাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে না থাকলে পৃথিবীতে কী হতো?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গ্রিন হাউজ কেন গরম থাকে? ব্যাখ্যা কর।
২. পৃথিবীকে কীভাবে একটি গ্রিন হাউজের সাথে তুলনা করা যায়?
৩. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্যাস বেড়ে যাওয়ার কারণগুলো ব্যাখ্যা কর।
৪. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কী কী হতে পারে? আলোচনা কর।
৫. জলবায়ু পরিবর্তন রোধে করণীয় আলোচনা কর।
৬. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে খাপ খাইয়ে চলা যেতে পারে তা আলোচনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদ কী?

প্রকৃতির যা কিছু আমাদের কাজে লাগে তাই প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন– মাটি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণী। আরো অনেক কিছু রয়েছে মাটি ও সাগরের তলদেশে, যেমন– প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, চুনাপাথর, লৌহ ইত্যাদি। এখানে রয়েছে নানা রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী। এ ছাড়া সূর্যরশ্মি হচ্ছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। যা উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন কাজে লাগে।

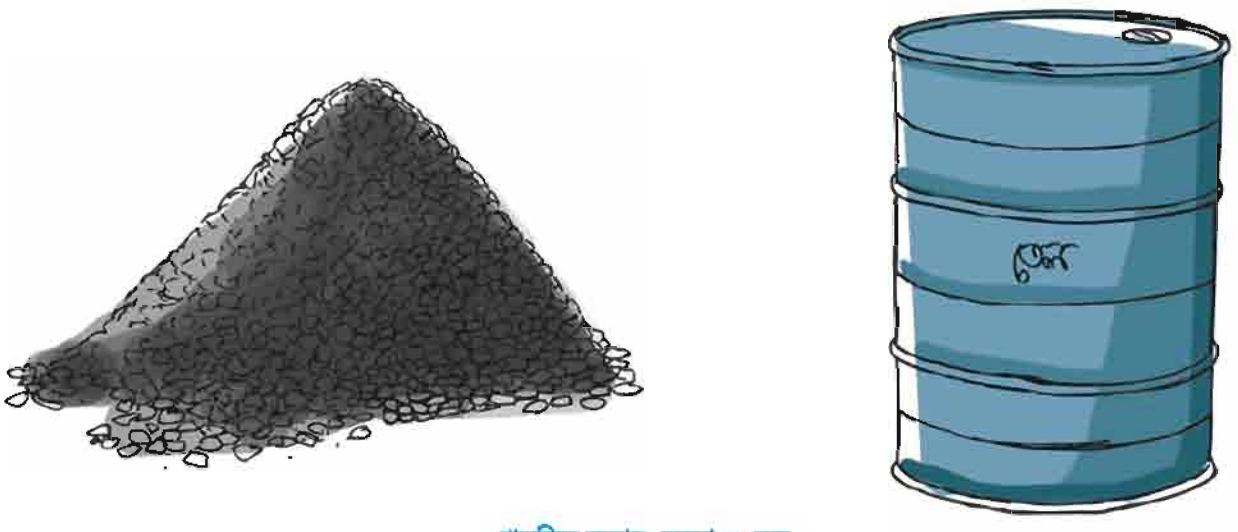

প্রাকৃতিক সম্পদ: কয়লা ও তেল

কৃত্রিম সম্পদ কী?

তোমাদের বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, টুল, আলমারি তৈরির জন্য কাঠ কোথা থেকে এসেছে? বাড়িঘর তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ কোথা থেকে পাওয়া যায়? এসবই গাছ কেটে তৈরি করা হয়েছে। আমরা যে লোহার তৈরি কোদাল, কাস্তে, বটি ব্যবহার করি তা মানুষ তৈরি করেছে। এ লোহা কৃত্রিম সম্পদ। কিন্তু লোহা তৈরি হয়েছে প্রকৃতিতে পাওয়া খনিজ আকরিক থেকে। আবার জানালার কাচ তৈরি করা হয় এক ধরনের বালুকণা দিয়ে। এখানে বালু প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কাচ কৃত্রিম সম্পদ।

বাড়িঘর

বাস

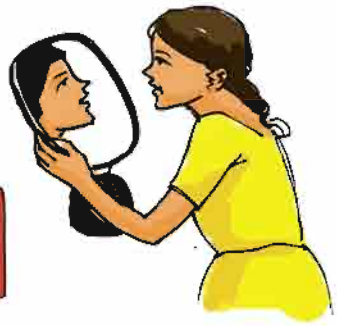

আয়না

চশমা

টিভি দেখার দৃশ্য

গাড়ি চালানো

আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বায়ু, পানি, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি সবকিছুর উৎস হচ্ছে প্রকৃতি। একইভাবে টেলিভিশন দেখার জন্য বিদ্যুৎ এবং মোটর গাড়ি চালানোর তেল বা গ্যাসও পাওয়া যায় প্রকৃতি থেকে।

কাজ:

নিচের ছকটি খাতায় একে তোমার বাসস্থানের প্রধান কয়েকটি বস্তু তৈরিতে কী কী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে তার নাম লিখ।

কৃত্রিম সম্পদ তৈরিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার	
বস্তুর নাম	ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের নাম
টেবিল	
আলমারি	
চুলা	
মশারি	
পাখা	

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশ আয়তনের বিবেচনায় পৃথিবীর একটি ছোট দেশ। এর প্রাকৃতিক সম্পদও খুব কম। এর মধ্যে রয়েছে সমতল ভূমি, হাওড়, বিল, বনাঞ্চল, পাহাড়, নদীনালা ও বঙ্গোপসাগরের কিছু অংশ এবং নানাজাতের উদ্ভিদ ও প্রাণী। এছাড়াও রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও চুনাপাথর ইত্যাদি। এসব জ্বালানি বাড়িঘর, কলকারখানা, শিল্প, যানবাহন ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ভূগর্ভে আরো প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।

নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ

সব প্রাকৃতিক সম্পদ এক রকম নয়। কোনো কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরায় ব্যবহারযোগ্য। এগুলোকে বলা হয় নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন– গাছপালা, পশুপাখি, পানি, বায়ু ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ একবার নিঃশেষ হলে আর জন্মায় না বা পাওয়া যায় না। এগুলোকে বলা হয় অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন – প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য। এ সকল সম্পদের সরবরাহ খুবই সীমিত। একটা সময় পরে এ গুলোকে আর পাওয়া যাবে না।

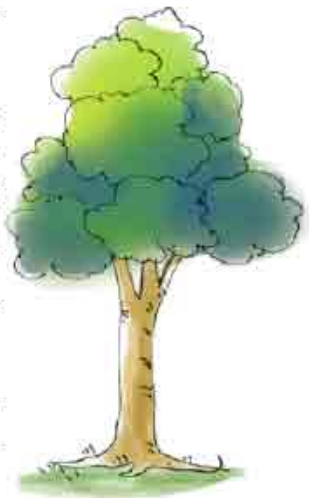

নবায়নযোগ্য

অনবায়নযোগ্য

সৌর প্যানেল

সৌরশক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশের জন্য জ্বালানি আরও একটি বিকল্প উৎস হচ্ছে সৌরশক্তি। তেল, গ্যাস বা কয়লার মত সম্পদ কমে যাওয়ায় সৌরশক্তি এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সৌরপ্যানেলে সৌরশক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাসা, অফিস ও জলসেচ কাজে এই সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া ক্যালকুলেটরেও সৌর শক্তি ব্যবহার করা হয়।

বর্তমান ছোট্ট পরিসরে সৌরশক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা চলছে। বাড়িঘর আলোকিত করা, ফ্রিজ চালানো, টেলিভিশন চালনো, পানি সেচ ইত্যাদি কাজে এর সম্ভাবনা বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সৌরশক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাসাবাড়ির জন্য সৌর বিদ্যুতের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনের জন্য ঋণ দেয়া হচ্ছে। যার ফলে গ্রামের লোকজন সৌর শক্তি ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক বাতি, টিভি, রেফ্রিজারেটর, কম্পিউটার ইত্যাদি চালাতে পারে। যদিও এই সুযোগ মূলত দিনের বেলার জন্য। তবে ব্যাটারি চার্জ করে তা রাতেও ব্যবহার করা যায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহারে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না।

সম্ভাবনাময় বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বায়ু শক্তি

বায়ু একটি নির্মল জ্বালানির উৎস, যা পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। বায়ুপ্রবাহকে ব্যবহার করে মানুষ অনেক কাজ করছে। ঘুড়ি উড়ানো, পাল তুলে নৌকা চালানো, গাড়ির চাকায় হাওয়া দেওয়া ইত্যাদি তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো। তবে অনেক দেশ বায়ুশক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

চিত্রটি লক্ষ করো। বায়ু প্রবাহের এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক দেশে কল করাখানা চালিয়ে থাকে। এছাড়া শক্তি উৎপাদন ও সেচ কাজে বায়ুকল বা উইন্ডমিল ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশেও বায়ু শক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের উপকূলীয় এলাকায় এবং বঙ্গোপসাগরের দ্বীপসমূহে বায়ু শক্তি ব্যবহার করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসাবে বায়ুশক্তি ও সৌর শক্তির ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা, বায়ু ও সৌরশক্তি আহরণে অবকাঠামোগত খরচ ছাড়া অন্য কোন খরচ লাগে না। পরিবেশ দূষণ হয় না বলে এ জাতীয় শক্তি সবুজ শক্তি । তাই এগুলোই ভবিষ্যৎ জ্বালানির উৎস।

বায়ু প্রবাহের ব্যবহার

সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও পরিকল্পিত ব্যবহার

প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত তাই আমাদেরকে এর ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে।

আমরা জেনেছি কতগুলো সম্পদ নবায়নযোগ্য। যেমন– পানি, বায়ু ও সৌরশক্তি। আবার কতগুলো অনবায়নযোগ্য। যেমন মাটিস্থ ধাতু, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানির চাহিদাও বাড়ছে । বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন আগামী ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব তেল, গ্যস বা কয়লার মত জ্বালানি শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই অনবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি যত্নবান হতে হবে। তাপশক্তি, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও পানি শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। সীমিত ব্যবহারের পাশাপাশি বিকল্প সম্পদের উপায় উদ্ভাবনে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। যাতে ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানোর পথ উন্মুক্ত থাকে।

সম্পদ সংরক্ষণে কী কী করণীয়?

পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু সুখবর আছে। বহু মানুষ এখন পরিবেশ সংরক্ষণে সচেষ্ট। পরিবেশকে নিরাপদ রাখা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারই হচ্ছে সংরক্ষণ।

তোমরাও সম্পদের সংরক্ষণে অভ্যস্ত হতে পার। সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ হ্রাসে বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পার, যেমন– ব্যবহারের মাত্রা কমানো, অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বন্ধ করা, পুনঃব্যবহার এবং পুনঃউৎপাদন।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

ক. অনবায়নযোগ্য সম্পদের মধ্যে আমাদের দেশে দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে ——— গ্যাস।
খ. সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের প্রধান তিনটি উপায় হচ্ছে কম ব্যবহার, ——— পুনঃউৎপাদন।
গ. বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে বাড়িঘরেও ——— শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে।
ঘ. চট্টগ্রামের কাপ্তাই নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে ——— উৎপাদন করা হচ্ছে ।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. কোনটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ?

ক. তেল　　খ. পানি
গ. গ্যাস　　ঘ. জীবাশ্ম জ্বালানি

২. বিজ্ঞানীদের মতে আগামী ১০০ বছরে ফুরিয়ে যেতে পারে –
ক. প্রাকৃতিক সম্পদ খ. প্রাণী সম্পদ
গ. জীবাশ্ম সম্পদ ঘ. বায়ু সম্পদ

৩. কোনটি অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ?
ক. বায়ু খ. কাঠ
গ. তেল ঘ. পানি

৪. সবুজ শক্তি (গ্রিন এনার্জি) বলতে বুঝায় ?
ক. গ্যাস খ. বায়ুপ্রবাহ
গ. তেল ঘ. কয়লা

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশের মিল কর

বাম	ডান
ক. সবুজ জ্বালানি	ক. পরিকল্পিত ব্যবহার
খ. সম্পদ সংরক্ষণ	খ. বালু কণা দিয়ে
গ. প্রাকৃতিক সম্পদ	গ. বায়ু শক্তি
ঘ. অনবায়নযোগ্য জ্বালানি	ঘ. হাওড়, বাওড়, বিল
ঙ. কাচ তৈরি হয়	ঙ. তেল, গ্যাস, কয়লা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জীবাশ্ম জ্বালানি কী তা বর্ণনা কর।
২. সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের তিন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. উইন্ডমিল কী? বর্ণনা কর।
৪. প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহারের একটি তালিকা তৈরি কর।
৫. সোলার প্যানেল কী? বর্ণনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

মানুষের সঙ্গে পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আমরা আগে জেনেছি। আরো জেনেছি, প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর অধিক জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব। বুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্যই মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। তাই পরিবেশকে বাসযোগ্য রাখার দায়িত্ব মানুষেরই।

কাজ: এবারে নিচের ছক খাতায় এঁকে বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোয় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ওপর কোন ধরনের প্রভাব হয়, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পরিবেশের উপাদান	অধিক জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব
মাটি	
পানি	
বায়ু	
উদ্ভিদ	
প্রাণী	

তোমার এ তালিকা শিক্ষককে দেখাও। বাবা–মাকেও তালিকাটি দেখাবে।

আমরা জানি, বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও, পৃথিবীর মধ্যে একটি ঘনবসতির দেশ। ফলে জনপ্রতি জমির পরিমাণ খুব কম। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ও কলা–কৌশলগত যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করলে জনসংখ্যাও জনসম্পদে রূপান্তর করা যায়।

আসলে জনসংখ্যা বলতে কী বুঝায়?

কোন দেশের ছোট–বড় ছেলে–মেয়ে ও পুরুষ–মহিলা মিলে যে মোট লোকসংখ্যা হয়, তাই জনসংখ্যা। জনসংখ্যার হিসাব জানার জন্য সব দেশে একটি নির্দিষ্ট দিনে ঘরে ঘরে গিয়ে লোকের সংখ্যা গণনা করা হয়। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় আদমশুমারী, যা সাধারণত প্রতি দশ বছর পর পর করা হয়। নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিগত ৭০ বছরের পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান	
সন	লোকসংখ্যা
১৯৪১	৪ কোটি ২০ লক্ষ
১৯৫১	৪ কোটি ১৯ লক্ষ
১৯৬১	৫ কোটি ৫২ লক্ষ
১৯৭৪	৭ কোটি ৬৪ লক্ষ
১৯৮১	৮ কোটি ৯৯ লক্ষ
১৯৯১	১২ কোটি ১৪ লক্ষ
২০০১	১২ কোটি ৯৩ লক্ষ
২০১১	প্রায় ১৫ কোটি

খেয়াল করো, ১৯৭৪ সন থেকে ২০১১ সন এই ৩৭ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

মানুষের মৌলিক চাহিদা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

কাজ: লোকসংখ্যা বাড়তে থাকলে প্রথমত কী কী চাহিদা বাড়তে থাকে নিচের ছক খাতায় একে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ক্রমিক নং	জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের কী কী চাহিদা বাড়ে
০১	
০২	
০৩	
০৪	

তোমার তালিকায় প্রথমে নিশ্চয়ই আছে খাবার। তারপর কাপড়–চোপড়, থাকার জায়গা, খেলার জায়গা, চিকিৎসা ইত্যাদি। এগুলোই হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা। আবার বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগ হবে পড়াশুনা, যাতায়াত, ঘর ও বাইরে খেলার চাহিদা। এর সংগে অবশ্য বাড়তে থাকবে হাট–বাজার, রাস্তা–ঘাট, যানবাহন, শিল্প–কারখানা এবং কর্মসংস্থানের চাহিদা।

বাড়তি জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা মেটানোয় কী ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হয়?

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা মাটি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে পেয়ে থাকি। আবার প্রয়োজনীয় বেশ কিছু পদার্থ, যেমন তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি মাটি থেকে আহরণ করা হয়। বাড়তি খাদ্য ও বাসস্থান তৈরির ফলে মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা ও প্রাণীর ওপর কীরূপ ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয় আমরা তাও জেনেছি।

বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে ঘরবাড়ি নির্মাণ

পরিবেশের ওপর প্রভাব

বাড়তি চাহিদা মেটানোর প্রচেষ্টায় গত ৪০ বছরে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। অপরদিকে অধিক মাত্রায় খাদ্যশস্য ও ফসল ফলানোর জন্য একই জমি বছরে একাধিকবার চাষ করা হয়। এতে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। তাই প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ও আগাছানাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হয়। বৃষ্টিপাত ও পানির সঙ্গে এসব রাসায়নিক দ্রব্য পুকুর, খাল, ডোবা ও নদীতে বাহিত হয়। স্টিমার ও অন্যান্য জলযান থেকে নির্গত বর্জ্য এবং মানুষের

পরিবেশের পরিবর্তন: পাহাড় কাটা ও নদী ভরাট করা

মলমূত্র নদীর পানিতে মিশে। এতে নদীর পানি দূষিত হয়। ফলে, মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ মারা যায়। অধিক সংখ্যক ডিজেল চালিত যানবাহন চলাচলে কার্বন ডাই–অক্সাইডসহ নানারকম ক্ষতিকর গ্যাস বায়ুতে মিশে বায়ুমণ্ডল দূষিত করছে।

জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব

অধিক সংখ্যক বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট তৈরি করায় বন জঙ্গলের গাছপালা কাটা হয়। আবাদি জমি ও অনাবাদি জমিতে বাড়িঘর ও রাস্তা তৈরি করা হয়। কোথাও জমিতে ইটের ভাটা, শিল্প, কারখানা ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এতে বনজঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে। কিছু কিছু গাছপালা ও পশুপাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এমনকি তারা লুপ্ত হচ্ছে। ফলে জীববৈচিত্র্যও হ্রাস পাচ্ছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর প্রভাব

জনসংখ্যাধিক্যের কারণে চিকিৎসা ব্যবস্থাও বেশ প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে। আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় ডাক্তার ও নার্স প্রয়োজনের চেয়ে কম। গ্রামীন ও শহরের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবার চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। সীমিত সম্পদে এ বাড়তি চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না।

কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব

দেশে নাগরিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিও একটি মৌলিক চাহিদা। কিন্তু সম্পদের অভাব ও অধিক জনসংখ্যার কারণে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে। উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

আমাদের সম্পদ সীমিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা, শিক্ষা, যোগাযোগ, বস্ত্র সকল ক্ষেত্রে সম্পদের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। এসকল সমস্যা সমাধানে কার্যকর পথ হলো আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারাকে ব্যবহার করা। বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের এবং প্রযুক্তির অভিনব উদ্ভাবন কাজে লাগিয়ে নতুন সম্পদের উৎস আমরা পেতে পারি। আমাদের উদ্ভাবন ব্যবস্থাগুলো উন্নততর ও দক্ষতর করতে পারি। যেমন– কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। খাদ্যের এই উৎপাদন বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও অতিক্রম করেছে।

উন্নততর শিক্ষা একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে যেমন অবদান রাখতে পারে, তেমনই শক্তির খরচও কমাতে পারে। এজন্য দক্ষতর যন্ত্র উদ্ভাবন, অন্যদিকে নতুন শক্তির উৎস অনুসন্ধান করতে হবে। প্রয়োজন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা ও চর্চা। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পারে। আবার কর্মদক্ষতার উন্নতি ঘটাতে পারে। উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারবে এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজতর করবে। আমরা দেশে ও দেশের বাইরেও কাজের সুযোগ পাব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নতুন নির্মাণ বস্তু উদ্ভাবন করতে পারে। ফলে, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও স্থানের অপ্রতুলতা কাটিয়ে ওঠার একমাত্র পথ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধিকতর চর্চা। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই আগের দিনে শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল লাগত। এর পরিমাণ ও মূল্য ছিল অনেক বেশি। কম্পিউটার ও মোবাইলে ব্যবহৃত কাঁচামাল যেমন– সিলিকন ও অন্যান্য বস্তুর মূল্য অতি নগণ্য।

আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো – তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হয়েও টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে অনেক তথ্য বিনিময় ও কাজ করা সম্ভব। এতে রাস্তায় ভিড় কমবে, তেল ও গ্যাসের অপচয় হ্রাস পাবে। পরিবেশ দূষণ কমবে। ভেবে দেখো, আধুনিক তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় একটি পেন ড্রাইভ বা ডিস্কেট অল্প জায়গায় অনেক তথ্য ধারণ করতে পারে। এর ফলে কাগজের অপচয় যেমন রোধ হলো, তেমনি তথ্য সংরক্ষণের জন্য জায়গাও কম লাগল।

আর একটি বড় লাভ তোমরা খেয়াল করেছ? কাগজ তৈরির জন্য যে বিপুল পরিমাণ গাছ আগে কাটতে হতো ও পরিবেশ দূষণ ঘটাতো তা থেকেও আমরা রক্ষা পেতে পারি।

মানুষ এখন আকাশকে ব্যবহার করছে চলাচলের জন্য। বহুতল বাড়ি নির্মাণ করছে বসবাসের জন্য। সৌর শক্তি ও পারমানবিক শক্তি ব্যবহার করছে তেল–কয়লা–গ্যাসের পরিবর্তে। এ সবই

৪। আত্ম–কর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়?

ক. সরকারি চাকুরি
খ. নিজের উদ্যোগে অর্থ উপার্জন
গ. শিল্প–কারখানায় চাকুরি
ঘ. বেসরকারি চাকুরি

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশের মিল কর

বাম	ডান
ক. বাড়তি জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা	ক. চাষের জমি, বনভূমি, জলাভূমি, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদি ধ্বংস
খ. বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে	খ. কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
গ. বাড়তি বাসস্থান নির্মাণের ফলে	গ. খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা
ঘ. কর্মক্ষম শিক্ষিত ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য	ঘ. বাড়তি রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে পরিবেশ দূষণ
	ঙ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাবগুলো লিখ।
২. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?
৩. প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব বর্ণনা কর।

সমাপ্ত

৪। আত্ম–কর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়?

ক. সরকারি চাকুরি
খ. নিজের উদ্যোগে অর্থ উপার্জন
গ. শিল্প–কারখানায় চাকুরি
ঘ. বেসরকারি চাকুরি

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশের মিল কর

বাম	ডান
ক. বাড়তি জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা	ক. চাষের জমি, বনভূমি, জলাভূমি, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদি ধ্বংস
খ. বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে	খ. কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
গ. বাড়তি বাসস্থান নির্মাণের ফলে	গ. খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা
ঘ. কর্মক্ষম শিক্ষিত ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য	ঘ. বাড়তি রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে পরিবেশ দূষণ
	ঙ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাবগুলো লিখ।
২. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?
৩. প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব বর্ণনা কর।

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৫-বি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত—বিক্রয়ের জন্য নয়।